জিহাদ ও জঙ্গীবাদ
প্রেক্ষিত
বাংলাদেশ
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

প্রকাশক :
শ্যামলবাংলা প্রকাশনী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ISBN : 978-984-33-1566-3

প্রকাশকাল :
এপ্রিল ২০১০ খৃষ্টাব্দ
চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
রবীউল আখির ১৪৩০ হিজরী

কম্পোজ ও বিন্যাস :
আল-ইসলাম কম্পিউটার্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রচ্ছদ ডিজাইন :
সুপারকম রিলেশন্স, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুদ্রণ :
সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, সপুরা রাজশাহী।

মূল্য : ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

JIHAD O JANGIBAD : PREKHIT BANGLADESH. Written by Dr. Muhammad Kabirul Islam, Published by Dr. A. S. M. Azizullah, Director, Shamol Bangla Prokashoni, Nawdapara, Sapura, Rajshahi. 1st Edition : April 2010. Price : Tk. 70/= Only. US $ 3.

উৎসর্গ

জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগে কারা নির্যাতিত
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সর্বস্তরের
নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

সূচিপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও স্পর্শকাতর বিষয় হল সন্ত্রাস। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার সম্পূর্ণ দোষ কোন প্রমাণ ছাড়াই মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ ঐ হামলার তদন্ত রিপোর্ট আজও প্রকাশ করা হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে কি-না আল্লাহ মা'লূম। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো নিজেরাই সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। জোটবদ্ধভাবে তারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনে লিপ্ত। তারা শুধু ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান ও ইরাকের ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংসই করেনি; প্রতিনিয়ত আকাশ থেকে বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণ করে সেখানকার অসহায় নারী, শিশু ও সাধারণ মানুষকেও হত্যা করে চলেছে। এসব মানুষের অপরাধ একটাই, তারা মুসলমান। বিশ্বের যেখানেই মুসলমানরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করছে, সেখানেই তারা মুসলমানদের নামের সাথে অন্যায়ভাবে সন্ত্রাসী বিশেষণ যোগ করছে। সেই সাথে চিরশান্তির ধর্ম ইসলামকেও সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে আখ্যায়িত করে চলেছে। এমনকি দখলদার ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোকেও তারা জঙ্গী বলে আখ্যায়িত করছে। প্রশ্ন হল যে আল-কায়দা বা ওসামা বিন লাদেনকে উপলক্ষ্য করে মুসলমানদের উপর এত অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতন ও গণহত্যা চালানো হচ্ছে, সেই বিন লাদেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কে লেলিয়ে দিয়েছিল? কে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার ব্যাপারে অস্ত্র দিয়ে, গোলাবারুদ দিয়ে, আধুনিক সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করেছিল? তাছাড়া কোন প্রকৃত মুসলমান কি এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমর্থন করে? পক্ষান্তরে যেসব জঙ্গীবাহিনী বা রাষ্ট্র (যেমন- ইহুদীবাদী ইসরাঈল, ভারতের উলফা গেরিলা, নেপালের মাওবাদী গেরিলা, শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগার প্রভৃতি) মুসলমান নয়, তাদেরকে ঐসব মোড়লরা কেন সন্ত্রাসী বা জঙ্গী বলছে না? বিষয়টি চিন্তাশীল মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশেও জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটেছে। ধর্মের নামে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, মূর্খ লোকেরা মুসলমানদের চিরশত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে একদিকে যেমন আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে বিতর্কিত করেছে; অন্যদিকে চিরশান্তির ধর্ম ইসলামকেও তারা কলঙ্কিত করেছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম কোন অবস্থাতেই জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। ইতোমধ্যে জেএমবির চিহ্নিত নেতাদের ফাঁসি হলেও তাদের অপতৎপরতা এখনো বন্ধ হয়নি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, জেএমবির মূল নেতা তথা গডফাদাররা আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এরা দেশ, জাতি, সমাজ ও ধর্মের শত্রু। অথচ বিগত চারদলীয় জোট সরকার এদেরকে নিয়ে খেলা করেছে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে যথাসময়ে তাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও তাদের দমনের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে 'এসব মিডিয়ার সৃষ্টি' বলে প্রকারান্তরে তাদেরকে আড়াল করা হয়েছে। অবশেষে বিশ্ব ও এদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ যে কোন ধরনের চরমপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করে একদিকে যেমন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মত এক ন্যক্কারজনক অপকর্মে লিপ্ত হয়; অপরদিকে তেমনি আহলেহাদীছ জামা'আতকে নেতৃত্বশূন্য করা এবং সাধারণ আহলেহাদীছ জনগণকে নিজেদের দলে ভিড়ানোর অপকৌশলে লিপ্ত হয়। অথচ তারা বিলক্ষণ ভুলে গিয়েছিল যে, আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বনকারী।

এদেশের ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ জিহাদ ও জঙ্গীবাদকে অনেক ক্ষেত্রে গুলিয়ে ফেলে। এটি মূলতঃ ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতারই ফল। তাছাড়া সন্ত্রাস দমনের নামে পাশ্চাত্য পরাশক্তিগুলো যেভাবে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে ভ্রান্ত অজুহাতে যথেচ্ছা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে ক্ষেত্র বিশেষে জিহাদ বা জঙ্গীবাদ অভিধাটি আপেক্ষিকতায় রূপ নিয়েছে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রণীত **'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'** পুস্তকটি এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা। তত্ত্ব ও তথ্যের সম্ভারে জিহাদ ও জঙ্গীবাদের ক্ষেত্রে বইটি একটি প্রামাণ্য দলীল বলা যেতে পারে। বইটি পাঠে একদিকে যেমন জঙ্গীবাদ সম্পর্কে বিস্ত-ারিত জানা যাবে, তেমনি জিহাদের প্রকৃত রূপও উন্মোচিত হবে। জিহাদ ও জঙ্গীবাদ সম্পর্কে জনমনের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনেও বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ও কারণ, কারা জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী এবং কারা জঙ্গীবাদ বিরোধী তাও জানা যাবে। তাছাড়া 'আন্দোলনে'র মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে যে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জঙ্গীবাদের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাও জাতির সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রস্ফূটিত হবে। সাথে সাথে এ ব্যাপারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন', 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও মাসিক আত-তাহরীকের জঙ্গীবাদ বিরোধী সাহসী ভূমিকাও ফুটে উঠবে।

চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইটিতে জিহাদ, সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রের আনুগত্য ও মুসলমানকে কাফের বলার বিধান সম্পর্কে দলীলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত। বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বলব, যারা জিহাদ ও জঙ্গীবাদকে এক মনে করে এ বই তাদের জন্য; যারা জিহাদ পছন্দ করে এ বই তাদের জন্য; যারা জঙ্গীবাদকে ঘৃণা করে এ বই তাদের জন্য; যারা জিহাদের প্রয়োজন নেই মনে করে এ বই তাদের জন্য; যারা জিহাদের প্রয়োজন আছে মনে করে এ বই তাদের জন্য। মহান আল্লাহ সকলকে সত্যিকার অর্থে জিহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তাওফীক্ব দান করুন এবং তাঁর দ্বীনের প্রকৃত মুজাহিদ হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

॥ প্রকাশক ॥

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ اَلْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (آل عمران : ١٠٢)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً (النساء : ١)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً (الأحزاب :٧١-٧٠)

সন্ত্রাস বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ও বহুল পরিচিত পরিভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। এতে ধ্বংস হচ্ছে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী স্থাপনা। খুন ঝরছে নিরীহ নিরপরাধ আদম সন্তানের। বিনষ্ট হচ্ছে তাদের মূল্যবান জান-মাল। শত-সহস্র নারী হচ্ছে স্বামী হারা, পিতা-মাতা হচ্ছেন সন্তানহারা, শিশুরা হচ্ছে পিতৃ-মাতৃহারা। এসব স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু এতে সন্ত্রাসীদের পাষাণহৃদয় কাঁপে না। বিরত হয় না তারা এ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে। বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল সব দেশেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। তবে বেশী ঘটছে মুসলিম দেশে। মুসলিম দেশ সমূহে সংঘটিত সন্ত্রাস, হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অস্থিরতা ইত্যাদির মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইন্ধন। এসব দেশ যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এজন্য নানা কৌশলে তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কৌশল হিসেবে বর্তমানে তারা সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করছে। এই সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ মুসলিম দেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে সে দেশকে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে তা ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকেও সন্ত্রাসী বলছে। অথচ ইসলাম ও মুসলমানরা সবসময়ই সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য এদেশের আপামর জনসাধারণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। তাই এদেশে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ থাকলেও সবাই শান্তি-সম্প্রীতির

মধ্যে বসবাস করে আসছে। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষ এদেশে থাকলেও প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মকর্ম পালন করত নির্বিঘ্নে, নির্ভাবনায় ও নিঃশঙ্কচিত্তে। কিন্তু হঠাৎ করে ১৯৯৯ সালে যশোর জেলায় অনুষ্ঠিত উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে উগ্রপন্থী একটি দলের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। যারা ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল তথা ১৪০৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে, ২০০২ সালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির জনসভায় এবং পরবর্তীতে ময়মনসিংহ সিনেমা হলে, গাইবান্ধায় যাত্রা প্যান্ডেলে একের পর এক বোমা হামলা করতে থাকে। এছাড়া গোপালগঞ্জ ও নওগাঁসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এনজিও অফিসে হামলা চালায়। এভাবে বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার মাধ্যমে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে, দেশে বিরাজ করে এক অস্থিতিশীল অবস্থা। জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। প্রচার মাধ্যমে ঐসব চরমপন্থী সন্ত্রাসী জঙ্গীদের কথা প্রকাশিত হলেও বিষয়টিকে কর্তৃপক্ষ আমলে নেননি; বরং ঐসব মিডিয়ার সৃষ্টি বলেও মন্তব্য করা হয়। সে সময় ঐসব জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় তারা সুযোগ পেয়ে যায়। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৪ জেলার ৬৩ জেলায় প্রায় ৫ শতাধিক স্থানে একযোগে বোমা হামলা চালায়। এভাবে জঙ্গীরা বোমা হামলা চালিয়ে বিচারকসহ বহু নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে।

এরা জিহাদের অপব্যাখ্যা করে জিহাদের নামে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ফলে সাধারণ মানুষের মনে জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে মানুষ জিহাদ ও জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদকে গুলিয়ে একাকার করে ফেলে। অথচ ইসলামে জিহাদের বিধান রাখা হয়েছে সকল বিপর্যয় ও অশান্তিকে দূরীভূত করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিধানের এক মহতি উদ্দেশ্যে। কিন্তু জঙ্গীদের কারণেই ইসলামের এই শাশ্বত বিধান সম্পর্কে জনমনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। তারা জিহাদ ও জঙ্গীবাদকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মনে করে জিহাদের কথা শুনলেই নাক সিটকায়। জিহাদ সম্পর্কে মানবমনের ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাতে এবং জঙ্গীবাদের স্বরূপ সম্পর্কে মানুষকে সম্যক অবহিত করতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। সাথে সাথে এর মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যে সর্বদা জঙ্গীবাদের বিরোধী তা জাতির নিকট সুস্পষ্ট করা এ গ্রন্থ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ পুস্তকে আমরা জিহাদ ও সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদের পরিচয়, সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ ও সন্ত্রাস দমনে করণীয় সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবনা সাবলীলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সন্ত্রাস সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিও আমরা পেশ করেছি। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর জঙ্গীবিরোধী অবস্থান তুলে ধরেছি। সাথে সাথে রাষ্ট্র বা সরকারের আনুগত্য করার

অপরিহার্যতা আমরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। কারণ জঙ্গীদের দাবী দেশের সরকার হচ্ছে তাগূত্বী সরকার, তাদের আনুগত্য করা হারাম, তাদের অধীনে চাকুরী করা হারাম, তাদের হত্যা করা বৈধ ইত্যাদি। মূলতঃ তাদের এসব অসার দাবীর প্রতিবাদে উপরোক্ত বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে।

জঙ্গীবাদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে দীর্ঘদিন কারা নির্যাতন ভোগকারী, অথচ জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন কণ্ঠস্বর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও **'শ্যামলবাংলা প্রকাশনী'**র পরিচালক ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমরা এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করছি।

বইটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করুন। বইটি প্রকাশে আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। বইটি পাঠ করে সুধী পাঠক উপকৃত হলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

আমার ক্ষুদ্র চেষ্টার প্রতিদান দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট একান্তভাবে কামনা করি। সেই সাথে মুদ্রণক্রটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সুধী পাঠকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সুপরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে বিবেচিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

॥ বিনীত লেখক ॥

প্রথম অধ্যায় : জিহাদ

জিহাদের পরিচয়

জিহাদের আভিধানিক অর্থ : সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রচেষ্টা, সাধনা, পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদি। الجهاد শব্দটি আরবী, যা الجهد মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। الجهد অর্থ হচ্ছে কষ্ট, ক্লেশ। যেমন বলা হয় جهدت جهادا أي بلغت مشقة 'আমি অতি কষ্ট স্বীকার করেছি'।[১] যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করেছেন এভাবে- أني أعوذ بالله من جهد البلاء 'আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি বিপদের কষ্ট থেকে'।[২]

শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করা ও প্রচেষ্টা চালানো অর্থেও الجهاد শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة অর্থাৎ সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও তাকে প্রতিহত করতে শক্তি, সামর্থ্য ব্যয় করেছে।[৩]

ফিরোযাবাদী বলেন, الجهاد শব্দটি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৪] যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَاهِدُوْا فِي اللَّه حَقَّ جِهَادِه 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত' *(হজ্জ ৭৮)*।

ইবনু ফারেস (রহঃ) বলেন, জিহাদ শব্দটি جهد থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে المشقة (কষ্ট, ক্লেশ)। আর এ অর্থে শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যেমন বলা হয়, جهدت نفسي وأجهدت (আমি পরিশ্রম করেছি এবং আমি সক্ষম হয়েছি)। এখানে الجهد অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ 'আর তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রম লব্ধ বস্তু ছাড়া' *(তওবা ৭৯)*।

পারিভাষিক অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্‌র পথে শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দ্বীনের সার্বিক সহযোগিতা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালিমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

The Noble Qur'an-এ জিহাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে- Holy fighting in the cause of Allah or any other kind of effort to make Allah's word (Islam)

---

১. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, ***ফাৎহুল বারী***, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯ খৃঃ/১৪১৯ হিঃ), পৃঃ ১৩৩; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ***ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব***, ২য় খণ্ড (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশঃ ২০০০ খৃঃ/১৪২১ হিঃ), পৃঃ ৬৪, টীকা নং ১ দ্রঃ।

২. ***বুখারী, মুসলিম, মিশকাত***, হাদীছ নং ২৪৫৭ 'ইস্তি'আযাহ' অনুচ্ছেদ।

৩. সাইয়্যেদ সাবিক্ব, ***ফিক্বহুস সুন্নাহ***, ৩য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৮৭ খৃঃ/১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ৭।

৪. মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী, ***আল-কামূসুল মুহীত***, ২য় খণ্ড (মিসরঃ আল-মাতবাআতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৩ খৃঃ), পৃঃ ২৮৬।

superior. 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্র যুদ্ধ কিংবা আল্লাহ্‌র কালাম (ইসলামকে) প্রতিষ্ঠিত করতে যে কোন প্রচেষ্টা'।[৫]

ওলামায়ে কেরাম জিহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল-

(১) আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, الجهاد غلب في عرف الشرع على جهاد الكفار وهو دعوهم إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا. 'জিহাদ শব্দটি শরী'আতের পরিভাষায় সাধারণভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অর্থেই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর এটা হচ্ছে দ্বীনে হক্বের প্রতি কাফেরদের দাওয়াত দেওয়া এবং কবুল না করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা'।[৬]

(২) আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, الجهاد في الشرع بذل الجهد في قتال الكفار. 'শারঈ পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালানো'।[৭]

(৩) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, هو بذل الجهود في قتال الكفار 'জিহাদ হচ্ছে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে প্রচেষ্টা ব্যয় করা'।[৮]

(৪) আল-কাশানী (রহঃ) বলেন, هو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين ودفع شر الكفار وقهرهم 'জিহাদ হচ্ছে ইসলামের দিকে আহ্বান, দ্বীনকে সুউচ্চ (প্রতিষ্ঠিত) করা, কাফেরদের অনিষ্ট প্রতিহত করা এবং তাদের দমন করা'।[৯]

(৫) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. 'জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং তাঁর অপছন্দনীয় বস্তু প্রতিরোধে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা'।

(৯) ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী বলেন,

هو بذل الجهد والكفاح بالوسائل السليمة أولا، ثم عند اقتضاء الأمر للمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد يلجأ إلى القتال لتحقيق السعادة الشاملة للبشرية في دنياهم وأخراهم كما ارتضاها الإله الحكيم، وكل جهد يبذل في هذا المضمار فهو في سبيل الله وحده ولارضائه فقط.

---

৫. ***The Noble Qur'an***, Translated by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali & Dr. Muhammad Muhsin Khan (Madinah : King Fahd Complex for the printing of the Holy Qur'an, 1404 H.), p. 871.
৬. ইবনুল হুমাম, ***ফাৎহুল কাদীর***, ৫ম খণ্ড, (কোয়েটা : আল-মাকতাবাতুল হালাবিয়া, তা.বি.), পৃঃ ১৮৭-৮৮।
৭. ***ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব***, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪, টীকা নং- ১।
৮. ***ফাৎহুল বারী***, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩।
৯. আল-কাশানী, ***কিতাবুল বাদায়ে ওয়াছ ছানায়ে ফি তারতীবিশ শারায়ে***, ৭ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.), পৃঃ ৯৮।

‘জিহাদ হচ্ছে প্রচেষ্টা চালানো বা শ্রম ব্যয় করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রথমত প্রতিরক্ষা করা। অতঃপর দাঈদের হেফাযত ও দেশ রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে যুদ্ধ-সংগ্রামের শরণাপন্ন হওয়া; যাতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর এক্ষেত্রে পরিচালিত সকল প্রচেষ্টা হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান ও রেযামান্দি হাছিলের উদ্দেশ্যে’।[১০]

মোটকথা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জান, মাল, যবান ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই হচ্ছে জিহাদ।

জিহাদের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের কল্যাণ সাধন, তার ইযযত-আব্রুর হেফাযত, জান-মাল রক্ষা এক কথায় তার সকল স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সত্য-ন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তির সাহায্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই হচ্ছে জিহাদ। এটা কোন ক্ষেত্র, বস্তু বা কর্মবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যাবতীয় অসত্য, অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম ও কুসংস্কারের বিলোপ সাধন এবং সকল প্রতিকূল শক্তির মোকাবিলায় সামগ্রিক কল্যাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জীবন ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি সকল প্রিয় বস্তুকে নিঃস্বার্থে বিলিয়ে দেয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য। নিছক রাজ্য-রাজত্ব, দিগ্বিজয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে যে রক্ত ক্ষয়, সংগ্রাম বা যুদ্ধ তাকে জিহাদ বলা যায় না। বরং জান-মাল কুরবান করে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার ও সর্বশক্তি নিয়োগ করে সকল প্রকার অন্যায়, যুলুম ও শোষণ বন্ধ করার প্রচেষ্টাই মূল জিহাদ। মুসলিম জনগণের জন্য এ জিহাদ ফরযে কিফায়া অর্থাৎ সমাজের একাংশ এ দায়িত্ব পালন করলে অন্য সবাই দায়মুক্ত হবে। কিন্তু কেউ এ দায়িত্ব পালন না করলে সবাই অপরাধী হবে। কারণ সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য জিহাদ অপরিহার্য। অন্যায়ে বাধা না পেলে অন্যায়কারী আরো বেপরোয়া হয়ে যায়। প্রকাশ্যে জোর-জবরদস্তি ও যুলুম-অত্যাচার শুরু করে। নিপীড়িত মানুষের সংখ্যা যত অধিক হোক না কেন চেতনার অভাবে তারা মার খেয়ে তা হজম করে। এই অশুভ সামাজিক পরিস্থিতি রোধ এবং এই অধঃপতন থেকে সমাজকে উদ্ধার করার জন্য জিহাদের প্রয়োজন।

জিহাদ বলতে কেবল শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকেই বুঝায় না। বরং শত্রুর যাবতীয় তৎপরতাকে কথা, কলম, সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিহত করার প্রচেষ্টাও জিহাদ। আবার কু-প্রবৃত্তি বা কু-প্ররোচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও জিহাদ। নবী করীম (ছাঃ) এ ধরনের জিহাদকে ‘জিহাদে আকবার’ বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা কু-প্রবৃত্তি ও পাপাত্মার কু-প্ররোচনা মানুষকে সর্বদা মন্দ পথে ধাবিত করে। গোপন শত্রু শয়তানকে এবং কু-প্রবৃত্তিকে দমন করা অত্যন্ত কঠিক কাজ। এজন্য একে ‘জিহাদে

---

১০. *ড. আবদুর রহমান ইবনু মা‘লা আল-লুআইহিক্ব,* ***আল-ইরহাব ওয়াল গুলূ, আল-ফুরক্বান*** *(কুয়েত: এপ্রিল ২০০৮), ৪৮৭ তম সংখ্যা, পৃঃ ৩৯।*

আকবার’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করলে, তাঁর কাছে জবাবদিহিতার ভয় থাকলে, কু-প্রবৃত্তি এবং শয়তানকে দমন করা সহজ হয়। আর এ দু’টিকে দমন করতে পারলে জান্নাতের পথ সুগম হয়।

জিহাদ ফরয হওয়ার সময়

মহানবী (ছাঃ) মক্কী জীবনে জিহাদের নির্দেশ পাননি; বরং এসময়ে তাঁকে কেবল দ্বীনে হক্বের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ফলে দাওয়াত ও তাবলীগের মধ্যেই তাঁর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম দিকে তিনি গোপনে দাওয়াত দিতেন। পরবর্তীতে প্রথমে তিনি স্বীয় নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দেন এবং পর্যায়ক্রমে মক্কাবাসীকে প্রকাশ্য দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এর ফলে তাঁর প্রতি মক্কার কুরাইশদের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এমনকি মুশরিকদের অত্যাচার মুসলমানদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। ফলে নবুওয়াত লাভের ১৩ বছর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মদীনায় গিয়ে তিনি আনছার, মুহাজির, আউস ও খাজরাযের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অবস্থানও সুদৃঢ় হয়। তখন আল্লাহ মুসলমানদেরকে কুরাইশদের সাথে জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন।[১১] ২য় হিজরী সনে মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বাক্বারার ২১৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরয করা হয়।[১২] এ মর্মে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়- أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ. ‘তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম’ *(হজ্জ ৩৯)*। তিনি আরো বলেন, وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. ‘আর তোমরা লড়াই কর আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না’ *(বাক্বারাহ ১৯০)*।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদের অনেক প্রকার রয়েছে। যথা- (১) অন্তর দ্বারা জিহাদ (২) যবানের মাধ্যমে জিহাদ বা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জিহাদ (৩) ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ (৪) সশস্ত্র জিহাদ বা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ।

---

১১. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব, ***মুখতাছার সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)***, (দামেশক : মাকতাবাতু দারুল ফীহা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪/১৪১৪ হিঃ), পৃঃ ১৪০-১৪১।

১২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, জিহাদ ও ক্বিতাল, ***মাসিক আত-তাহরীক***, ডিসেম্বর ২০০১, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৪।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান সমাজে সশস্ত্র যুদ্ধই কেবল জিহাদ বলে পরিচিত। অথচ শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি মুখ ও অন্তর দ্বারা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও অর্থ ব্যয় করাকেও জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা, তোমাদের জীবন দ্বারা ও তোমাদের যবান দ্বারা'।[১৩]

তিনি মুমিনের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে জিহাদের কয়েকটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 'যে ব্যক্তি তাদের বিপক্ষে হাত দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে কথা দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন। এরপরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই'।[১৪]

(১) অন্তর দ্বারা জিহাদ : কোন গর্হিত কাজ শক্তি বা বল প্রয়োগে প্রতিহত করা সম্ভব না হলে মনে মনে তা ঘৃণা করা হচ্ছে অন্তর দ্বারা জিহাদ।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

'যদি তোমাদের কেউ কোন গর্হিত কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। হাত দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব না হলে যবান দ্বারা প্রতিহত করবে। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক'।[১৬]

(২) যবানের দ্বারা জিহাদ বা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জিহাদ : প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষমতাধর, প্রভাবশালী ব্যক্তির সামনে হক্ব কথা বলা হচ্ছে যবানের মাধ্যমে জিহাদ। যেমন ইবরাহীম (আঃ) অত্যাচারী শাসক নমরূদের সাথে এবং নূহ (আঃ) তাঁর কওমের সাথে করেছিলেন। কুরআনুল কারীমে এসেছে নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনো ভ্রান্ত নই, কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে

---

১৩. ***নাসাঈ,*** *হা/৩০৯৬, হাদীছ ছহীহ; আবু**দাঊদ*** হা/২১৮৬; ***মিশকাত,*** হা/৩৮২১।

১৪. ***মুসলিম,*** 'ঈমান' অধ্যায় হা/৫০(১৭৯); ***মিশকাত*** হা/১৫৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

১৫. ***ফাৎহুলবারী,*** ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২।

১৬. ***মুসলিম,*** হাদীছ নং ৪৯ (১৭৭), 'ঈমান' অধ্যায়; ***আবুদাঊদ,*** হাদীছ নং ১১৪০ ও ৪৩৪০; ***তিরমিযী,*** হাদীছ নং ২১৭৩; ***ইবনু মাজাহ,*** হাদীছ নং ৪০১৩; ***রিয়াযুছ ছালেহীন,*** হাদীছ নং ১৮৩।

প্রেরিত রাসূল। আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৫৯-৬২)*।

শরী'আতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা মুনাফিকদের সাথে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে যুদ্ধ করা। এটা যবান দ্বারা জিহাদ করার একটা প্রকারও বটে। এ প্রকার জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, وَجَادِلْهُم بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ 'আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*।

(৩) ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ : বাতিল প্রতিহতকরণ ও হক্ব প্রতিষ্ঠায় অর্থ-সম্পদ কুরবানী করা হচ্ছে মালী জিহাদ বা ধন-সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানাদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে' *(ছফ ১০-১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা, তোমাদের জীবন দ্বারা ও তোমাদের যবান দ্বারা'।[১৭]

(৪) অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ : যুদ্ধক্ষেত্রে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে আঘাত ও পাল্টা আঘাতের মাধ্যমে জিহাদ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِه عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ. 'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর' *(আনফাল ৬০)*।

সশস্ত্র জিহাদ হচ্ছে জিহাদের সর্বোচ্চ প্রকার। এরপর আর কোন প্রকার নেই। আল্লাহ্‌র বাণীতেই তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'আর তাদের সাথে লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায়, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। আর কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ১৯০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ. 'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি

১৭. ***নাসাঈ**, হা/৩০৯৬, হাদীছ ছহীহ;* ***আবুদাঊদ*** হা/২১৮৬; ***মিশকাত**,* হা/৩৮২১।

জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র)' *(বাক্বারাহ ১৯৩)*। তিনি আরো বলেন, قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ. 'যুদ্ধ কর তাদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন' *(তওবা ১৪)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে' *(তওবা ২৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 'আর মুশরিকদের সাথে তোমরা সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর যেমন তারাও তোমাদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন' *(তওবা ৩৬)*। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন' *(তওবা ১২৩)*।

জিহাদের স্তরসমূহ

জিহাদের ৪টি স্তর রয়েছে। যথা- ১. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

১. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ : কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ নানা রকম অন্যায়, অনাচার, অবিচার, যুলুম-অত্যাচার ও পাপকর্মের দিকে ধাবিত হয়। কু-প্রবৃত্তি বা পাশবিক শক্তি মানুষকে গর্হিত ও ইসলাম বিরোধী কাজে প্ররোচিত করে ও প্রেরণা যোগায় এবং ভাল কাজে তথা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জৈব উপাদানে পুষ্ট ও পাশবিক শক্তিতে বলীয়ান কু-প্রবৃত্তির ফলে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক অবনতি ঘটে। মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটলে সে নানা প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীল কাজ করে বসে। এহেন জঘন্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নফস বা কু-প্রবৃত্তি দমনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো অতীব যরূরী। আর এটাই হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে বা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

‘তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ না করবে’।[১৮]

মানুষ এ কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মেনে চললে জান্নাত লাভ তার জন্য সহজতর হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّـةَ هِـيَ الْمَـأْوَى. ‘আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নিজ আত্মাকে কু-প্রবৃত্তির হাত হতে রক্ষা করে তার স্থান অবশ্যই জান্নাতে’ *(নাযি‘আত ৪০-৪১)*।

২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ : শয়তান মানব মনে যে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং অন্তরে যে কু-মন্ত্রণা দেয় তা প্রতিহত করাই হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। শয়তানের ধোঁকায় যাতে মানুষ পতিত না হয়, সেজন্য আল্লাহ তাকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, ‘হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়’ *(ফাতির ৫-৬)*।

৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ : মুনাফিকরা মুসলিমদের ছদ্মবেশ ধারণ করে ইসলামের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। তারা পোশাক-পরিচ্ছদে ও বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে উপস্থাপন করে। কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে ইসলাম ধ্বংসের সুগভীর ষড়যন্ত্র। মূলতঃ যথার্থ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করা এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। এটাই হচ্ছে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এ জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। আর সেটা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল’ *(তওবা ৭৩; তাহরীম ৯)*।

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে মুনাফিকদের সাথে জিহাদ অত্যন্ত কঠিন। কেননা কাফিরদের চেনা যায় ও তাদের শত্রুতা জানা যায়। কিন্তু মুনাফিকদের চেনা কষ্টসাধ্য এবং তাদের ষড়যন্ত্র অবগত হওয়াও দুরূহ।

৪. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ : কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল প্রকার শক্তি দিয়ে জিহাদ করা। অর্থাৎ তাদের সাথে জান, মাল, যবান ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَجَاهِدُوْا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ

---

১৮. ***শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত,*** হাদীছ নং ১৬৭।

مِـنْ حَـرَجٍ. 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি' *(হজ্জ ৭৮)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَـادًا كَبِيْـرًا. 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন' *(ফুরক্বান ৫১-৫২)*।

জিহাদের উদ্দেশ্য

ইসলামে জিহাদ স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার জন্য নয়। যদি নিয়তের মধ্যে খুলূছিয়াত না থাকে এবং ব্যক্তি স্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে সেটা জিহাদ হিসাবে কবুল হবে না। জিহাদের আরো কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করব।

১. আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য :

আল্লাহ বলেন, وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ 'তিনি রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিনী দ্বারা, যাদেরকে তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্‌র ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন' *(তাওবা ৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্‌র কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[১৯] আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল দ্বীনের উপরে তিনি বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ এটা পসন্দ করে না' *(ছফ ৯)*।

আল্লাহ্‌র কলেমাকে সমুন্নত করা ও আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য দ্বীনসমূহের উপরে বিজয়ী করার বিষয়টি শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। সামরিক ও

---

১৯. ***মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত*** *হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যেমন প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যরূরী, তেমনি শান্তির অবস্থায় কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যরূরী।

১৯০ বছরের ইংরেজ শাসন যেমন এদেশের মানুষকে খৃষ্টান বানাতে পারেনি, তেমনি প্রায় ৬৫০ বছরের মুসলিম শাসন ভারতবর্ষকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারেনি। কেননা অস্ত্র, অর্থ ও ক্ষমতা কখনোই স্থায়ী হয় না এবং তা কখনোই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী রেখাপাত করে না। কিন্তু আদর্শ বা দ্বীন মানুষের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যা শত শত বছর ধরে বজায় থাকে। তাই অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করতে গেলে সাময়িক সশস্ত্র যুদ্ধ বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই চিন্তা, যুক্তি, বিজ্ঞান সবকিছু দিয়ে অন্য দ্বীনকে পরাভূত করা। নবীগণ সকল যুগে মূলতঃ এ দায়িত্বই পালন করে গিয়েছেন।

অতএব আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য প্রয়োজন মুহূর্তে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', মুখের ভাষা ও লেখনীর মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাও তেমনি 'জিহাদ'। কেননা অন্যান্যদের ন্যায় দুনিয়াবী স্বার্থে যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল 'মানবতার কল্যাণ সাধন ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন'। আর এজন্য সর্বতোভাবে শক্তি অর্জন করা যরূরী।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেও যারা অনৈসলামী আইনে শাসিত হচ্ছেন, তারা নিজ রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও শাসন জারির পক্ষে জনমত সংগঠন করবেন ও সবশেষে তা পরিবর্তনের জন্য ইসলামী পন্থায় চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাবেন। আর যারা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেন, তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করবেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সাধ্যমত আপোষহীন থাকবেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কী জীবনে বাস করেছিলেন।[২০]

২. কাফিরদের ভীতি প্রদর্শন ও তাদের বিরোধিতা প্রতিহত করা : দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করা, দ্বীন বিরোধীদের ও শত্রুদের শত্রুতা প্রতিহত করা এবং কাফিরদের সকল ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা প্রতিরোধ করতেই জিহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।[২১]

---

২০. **মাসিক আত-তাহরীক**, ডিসেম্বর ২০০১, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১১।

২১. ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, ***আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,*** ৬ষ্ঠ খণ্ড (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ৯০।

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ. 'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই। কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)' *(বাক্বারাহ ১৯৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'যখন ফেরেশতাদেরকে তোমাদের পরওয়ারদেগার নির্দেশ দান করেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্ত সমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে মার জোড়ায় জোড়ায়' *(আনফাল ১২)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর' *(আনফাল ৬০)*।

২. ইক্বামতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা : ইসলামকে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করার সার্বিক ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. 'তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা সেটা অপছন্দ করে' *(ছফ ৯; তওবা ৩৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (ইসলাম) অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহই যথেষ্ট' ***(ফাতহ ২৮)***।

ইক্বামতে দ্বীনের অর্থ : ইক্বামত অর্থ কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বীন অর্থ হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য। সুতরাং ইক্বামতে দ্বীন অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র একত্ব প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বর্তমান যুগের কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে দ্বীন অর্থ 'হুকূমত' (রাষ্ট্রক্ষমতা) করেছেন। ইসলামী হুকূমত কায়েমের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুসলমানের উপরে অপরিহার্য দায়িত্ব। আর সেটা হল ইক্বামতে দ্বীনের একটি অংশ মাত্র। একমাত্র ইক্বামতে দ্বীন নয়। কেননা পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থই হল পূর্ণাঙ্গ ইক্বামতে দ্বীন। যার অর্থ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধান ও দাসত্বকে কবুল করা ও তা বাস্তবায়িত করা। রাষ্ট্রীয়

ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাও মুমিনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যে দায়িত্ব পালন করতে সকল মুমিন বাধ্য।[২২]

ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِه نُوْحًا وَّالَّذِىْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ-

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন ক্বায়েম করো এবং দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করো না’ *(শূরা ১৩)*।

৩. হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ : হক্ব ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। হক্ব সর্বদা বিজয়ী হয় আর বাতিল পরাভূত হয়। কিন্তু কখনো যদি বাতিলের দ্বারা হক্ব পরাভূত হয়, তখনই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিতে বিঘ্ন ঘটে, বিপর্যস্ত হয় সামাজিক ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃংখল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না’ *(মুমিনূন ৭১)*।

মূলতঃ বাতিল সর্বদা পরাভূত হয়েই থাকে। আল্লাহ আরো বলেন, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا. ‘বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল’ *(বনী ইসরাঈল ৮১)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ. ‘বলুন, সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে ও না পারে পুনঃপ্রত্যাবর্তিত হতে’ (*সাবা ৪৯*)। তিনি আরো বলেন, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ. ‘যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন’ *(আনফাল ৮)*। তিনি আরো বলেন, وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِه إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ. ‘আল্লাহ মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং স্বীয় বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন’ *(শূরা ২৪)*।

---

২২. বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ***ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি,*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ৩-১৩।

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বাস্তবায়ন : ‘আমর বিল মা‘রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ইসলামের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাই পৃথিবীতে আগত সকল নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিল। এটা মুসলিম উম্মাহ্‌রও এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে। মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ. ‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে’ *(আলে ইমরান ১১০)*। তিনি আরো বলেন, ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হবে সফলকাম’ *(আলে ইমরান ১০৪)*।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান সম্পর্কিত উম্মাতে মুসলিমার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তারা এমন লোক, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত’ *(হজ্জ ৪১)*।

হাদীছে এসেছে, عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা‘আলা নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা (আযাব মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দো‘আ করবে কিন্তু তোমাদের দো‘আ কবুল করা হবে না’।[২৩]

জিহাদের শর্তাবলী

জিহাদ ইসলামের এক শাশ্বত বিধান, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ বিধান যে কেউ তার খেয়ালখুশী মত জারী বা বাস্তবায়ন করতে পারে না। বরং এর জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান না থাকলে জিহাদ

২৩. ছহীহ *তিরমিযী,* হাদীছ নং ২১৬৯;*মিশকাত,* হাদীছ নং ৫১৪০; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৪৯১৩।

বৈধ হবে না। নিম্নে শর্তগুলো উপস্থাপন করা হল- (১) মুসলিম শাসক বিদ্যমান থাকা, (২) পক্ষ-বিপক্ষ সুস্পষ্ট হওয়া, (৩) যথার্থ ও পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ্য থাকা।[২৪]

১. মুসলিম শাসক বিদ্যমান থাকা : জিহাদ হতে হবে মুসলিম শাসকের অধীনে। যিনি দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি দ্বীন রক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য জিহাদ ঘোষণা করলে জনগণ তাতে অংশগ্রহণ করবে। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান জিহাদ করতে অনিচ্ছুক হলে তার দায়ভার জনগণের উপর বর্তাবে না। এর জন্য জনগণ দায়ী বা গোনাহগার হবে না। কিন্তু এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিহাদের ঘোষণা দিলে বা জিহাদ পরিচালনা করলে তা হবে জিহাদের নামে সন্ত্রাস। জিহাদ কেবল সরকার প্রধানের অধীনে হতে হবে। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه، ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان بذلك أجـــره. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘সরকার প্রধান হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। তাঁর পশ্চাতে (অধীনে) থেকে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁর মাধ্যমেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি যদি আল্লাহভীতির নির্দেশ দেন এবং ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে এর দ্বারা তিনি ছওয়াব পাবেন’।[২৫]

তিনি আরো বলেন, لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا اســـتنفرتم فـــانفروا ‘এ বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের) পর আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। যখন তোমাদেরকে (যুদ্ধের জন্য) বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে’।[২৬]

روي اللالكائي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم إلى أن قال فان الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيـــه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولى الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيئ.

‘আল্লামা লালকাঈ (রহঃ) ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ও আবু যুর‘আহকে দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অভিমত জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা মক্কা,

---

২৪. ***মানহাজুল জমঈয়ত লিদদাওয়াতে ওয়াত তাওজীহ*** (কুয়েত : জমঈয়াতু এহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ৪৮-৫৩।

২৫. ***বুখারী***, হাদীছ নং ২৯৫৭; ***মুসলিম***, হাদীছ নং ১৮৩৫।

২৬. ***বুখারী***, হাদীছ নং ১৮৩৪; ***মুসলিম***, হাদীছ নং ১৪৮৮।

মদীনা, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়ামান সহ সকল শহরের ওলামায়ে কেরামকে এ মতের উপর পেয়েছি যে, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রেরণের সময় থেকে শুরু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের নেতাদের (রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তির) সঙ্গে মিলেই জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। এ জিহাদকে কোন কিছুই বিনষ্ট করতে পারবে না’।[২৭]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته فيمـــا يـــراه. ‘জিহাদের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের উপর নির্ভরশীল। আর প্রজাদের জন্য আবশ্যক হল শাসক যে নির্দেশ দেন তা মান্য করা’।[২৮]

আবুল কাসেম আল-খারকী বলেন, وواجب على الناس إذا جاءهم العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر، ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمـــير. ‘শত্রু এসে পড়লে কম-বেশী পরিমাণে যাই হোক না কেন জনগণের জন্য আবশ্যক হল শত্রুর মোকাবিলায় বের হয়ে পড়া। তবে তারা শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হবে না’।[২৯]

আবুত ত্বাইয়্যেব মুহাম্মাদ ছিদ্দীক্ব হাসান খান কানূজী বলেন, الجهاد فرض واجب على الأمة، وأن وجوبه لم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم وأن الإمام شرط في أدائه والقيام به. ‘উম্মাতে মুসলিমার উপর জিহাদ ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালে এ ফরয রহিত হয়নি। তবে এ জিহাদের বিধান পালন করতে শাসক হচ্ছেন শর্ত’।[৩০]

উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি স্বীয় জান-মাল, ইয্যত-আব্রু ও পরিবার-পরিজন রক্ষার্থে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে আইনের আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, إذ كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الإمام، ولكن لا يقاتلون إذا لم يخافوا على أنفـــسهم وذراريهـــم إلا أن يـــأذن الإمام. ‘জনগণ নিজ ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার আশংকা করলে শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু নিজ ও পরিবার-পরিজনের জন্য কোন ভয়-ভীতি না থাকলে শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না’।[৩১]

---

২৭. ***মানহাজুল জমঈয়ত***, পৃঃ ৪৯-৫০; ***ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস***, পৃঃ ৭৫-৭৬।
২৮. ***মুওয়াল্লাফাতুশ শায়খ***, পৃঃ ৩৬০; ***মানহাজুল জমঈয়ত***, পৃঃ ৫০, টীকা নং ১।
২৯. ***মানহাজুল জমঈয়ত***, পৃঃ ৫০, প্রাগুক্ত।
৩০. ***আল-ইবরাতু মিম্মা জাআ ফিল গাযওয়া ওয়াশ শাহাদাতে ওয়াল হিজরাতে***, পৃঃ ১৭৯।
৩১. ***মানহাজুল জমঈয়ত***, পৃঃ ৫০, টীকা নং ১।

২. পক্ষ-বিপক্ষ সুস্পষ্ট হওয়া : জিহাদ হয় অমুসলিম, কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম পক্ষ স্পষ্ট হতে হবে। পক্ষ-বিপক্ষ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ ছিল প্রত্যুষে আক্রমণ করা এবং তিনি প্রতিপক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আক্রমণ করতেন না। নিম্নোক্ত হাদীছটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكــان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর উদয় হওয়ার পর আক্রমণ করতেন। প্রথমে তিনি আযানের অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন নতুবা আক্রমণ করতেন।[৩২]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মুসলমানদেরকে মক্কার কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে বিরত রাখা হয়েছিল এজন্য যে, তখন অনেক মুসলমান নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস গোপন করে মক্কায় বসবাস করছিলেন। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি (মক্কায়) কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না, অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সবকিছু চুকিয়ে দেয়া হত। কিন্তু এজন্য তা করা হয়নি, যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে প্রবেশ করান। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম' *(ফাতাহ ২৫)*।

৩. যথার্থ ও পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ্য থাকা : প্রতিপক্ষ বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত ও দমন করার মত যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় না করা পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ নয়। কেননা এ অবস্থা কেবল পরাজয় ও ধ্বংসই ডেকে আনে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর উপর যুদ্ধের নির্দেশ আসেনি। এমনকি মদীনায় হিজরতের পরও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর' *(আনফাল ৬০)*।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

৩২. ***মুসলিম,*** হা/৮৪৭।

إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين و الكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته، كما نهى في أول الإسلام عن القتال كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم.

‘সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়টি শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক উত্তম নয়। আর এটা জ্ঞাত বিষয় যে, এ যুদ্ধ (কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরবর্তী যুগের আমীরগণের অত্যাচার ও সীমালংঘনের ব্যাপারে অবহিত করে গেছেন। কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটি ক্ষমতা বহির্ভূত। এর অকল্যাণের ভয়াবহতা কল্যাণের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘তুমি সে সব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমাদের নিজেদের হাতকে সংযত রাখ’ *(নিসা ৭৭)*।[৩৩]

সুতরাং কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কিংবা রাজ্য বিস্তার ও পররাজ্য গ্রাসের মানসে জিহাদ ঘোষণা করা হলে তা জিহাদ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা হবে সন্ত্রাস বা আগ্রাসন। পক্ষান্তরে কেউ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র অস্তিত্বের উপর আঘাত হানলে, ইসলামের অবমাননা করলে, মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে মুসলমানরা নীতিগতভাবে তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে। এতে অস্বীকৃতি জানালে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিয়ে বসবাসের প্রস্তাব দিতে হবে। এই দু'টি প্রস্তাবের কোনটি গ্রহণ না করে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে বসলে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জিহাদ করা যাবে। তবে এ জিহাদের ঘোষণা দিবেন রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক। রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য জিহাদ ঘোষণা করলে তা বৈধ হবে না।

জিহাদের গুরুত্ব

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বীন ও দেশ রক্ষা, বিদ্রোহ দমন, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রতিহত করতে জিহাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে জিহাদের গুরুত্বের কতিপয় দিক উল্লিখিত হল-

৩৩. ***মানহাজুল জমঈয়ত***, পৃঃ ৫৩।

(ক) আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত করা : আল্লাহ্‌র বাণী তথা পবিত্র কুরআন বিধর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের প্রতিহত করে আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদ একান্ত আবশ্যক। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে রাখার জন্য জিহাদ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় রয়েছে'।[৩৪]

(খ) আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা : মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা। এক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর আপতিত বিভিন্ন বিপদাপদ, বাধা-বিপত্তি, ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতা প্রতিহত করে যাবতীয় ফিৎনা-ফাসাদ নির্মূল করে আল্লাহ্‌র বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জিহাদের একান্ত প্রয়োজন। এমর্মে আল্লাহ পাক বলেন, 'আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন' *(আনফাল ৩৯)*।

(গ) মাতৃভূমি রক্ষা : দেশ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে কিংবা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলে শত্রুদের পরাভূত করে দেশ রক্ষার জন্য জিহাদ যরূরী। তেমনি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও দেশের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। তাদের মাতৃভূমি হতে তাদেরকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ' *(হজ্জ ৩৯)*।

(ঘ) নিরাপত্তা বিধান ও শান্তি স্থাপন : কোন শত্রু কর্তৃক দেশের শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হলে এবং দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে শান্তি স্থাপন ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য। তেমনি ইসলামী বিধিবিধান শান্তিপূর্ণভাবে পালনে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা ও শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌র নিরাপত্তার জন্য জিহাদ করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর লড়াই কর আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ১৯০)*।

---

৩৪. ***বুখারী, মুসলিম, মিশকাত*** হাদীছ নং ৩৮১৪।

(ঙ) অমরত্ব লাভ করা : যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে তারা চির অমর। জিহাদে জয় লাভ করলে ইতিহাসে গাযী হিসাবে অমর হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদে শাহাদত বরণ করলেও তারা শহীদ হিসাবে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে মানব হৃদয়ে বেঁচে থাকে এবং মৃত্যুর পরেও জান্নাতে তারা থাকে জীবিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيْلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُوْنَ.

'আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না' *(বাক্বারাহ ১৫৪)*।

(চ) ঈমানের পরিচয় : দ্বীনের জন্য ও মাতৃভূমির জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা ফরয। মুমিনরাই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَالَّذِيْنَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا.

'আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে, যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন' *(আনফাল ৭৪)*। পক্ষান্তরে কাফির, মুশরিকরা জিহাদ করে শয়তানের পথে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ آمَنُواْ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ.

'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। আর যারা কাফির তারা সংগ্রাম করে শয়তানের রাস্তায়' *(নিসা ৭২)*।

(ছ) জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ : মুজাহিদ পৃথিবীতে যেমন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন, পরকালেও তেমনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করেন। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে' *(ছফ ১০-১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحـــرس في سبيل الله. 'দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। তন্মধ্যে একটি হল ঐ চক্ষু,

যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে। আর অপরটি হল ঐ চক্ষু, যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের সময় পাহারায় থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে'।[৩৫]

(জ) জান্নাতের পথ সুগম হওয়া : মুজাহিদের জন্য জান্নাতের পথ সুগম হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّـــةَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জান্নাত প্রদানের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন' *(তওবা ১১১)*। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, فَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات. 'অনন্তর যারা হিজরত করেছে, ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে অত্যাচারিত হয়েছে ও যুদ্ধ করেছে এবং শহীদ হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপরাশি মোচন করে দিব এবং তাদেরকে জান্নাতে স্থান দিব' *(আলে ইমরান ১৯৫)*।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর বাণী প্রতিষ্ঠিত করা, দেশ রক্ষা, নিরাপত্তা বিধান, জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এজন্য আল্লাহ জিহাদের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন,.يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ. 'হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন' *(আনফাল ৬৫)*।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে এই জিহাদ যেন কোন ক্রমেই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা কিংবা দুনিয়াবী কোন সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য না হয়। বরং তা হতে হবে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

জিহাদের ফযীলত

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে তাঁর রাসূল (ছাঃ) এবং মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদ করা ফরয। এ জিহাদের ফযীলত অনেক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানাদারগণ! আমি কি তোমাদেকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে

---

৩৫. ***তিরমিযী***, হাদীছ নং ১৬৩৯, 'জিহাদের ফযীলত' অধ্যায়, পৃঃ ৩৮৫।

দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত এবং তা এমন মনোরম যা অনন্তকাল বাসের জন্য, এটাই মহা সাফল্য' *(ছফ ১০-১২)*।

জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করা হল।-

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, ছালাত আদায় করল ও রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র দায়িত্ব হয়ে যায়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ১০০ টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। তোমরা আল্লাহ্র নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরিভাগে করুণাময় আল্লাহ্র আরশ। সে স্থান হতে জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে'।[৩৬]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتي يرجع المجاهد في سبيل الله.

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে সত্যিকার জিহাদকারী জিহাদ হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত এমন ছিয়াম পালনকারী ও ছালাত আদায়কারীর মত যে সর্বদা আল্লাহ্র আয়াত তেলাওয়াতে রত থাকে এবং অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় ছিয়াম ও ছালাতে মশগূল থাকে'।[৩৭] অর্থাৎ জিহাদে গমন করার পর মুজাহিদের জন্য সর্বদা ইবাদতের ছওয়াব প্রদান করা হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হচ্ছে আমি আল্লাহ্র পথে নিহত হই অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই তারপর পুনরায় জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই'।[৩৮]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القتـــل في ســـبيل الله يكفر كل شئ الا الدين-

---

৩৬. ***বুখারী, মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৭৮৭, ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৬১৩।
৩৭. ***মুত্তাফাক আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬১৪।
৩৮. ***বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৬১৬।

৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ ঋণ ব্যতীত সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়'।[৩৯]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم، قـالوا يـا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال ان شهداء امتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد-

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে শহীদ বলে মনে কর? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তাকেই শহীদ বলে মনে করি, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা অনেক কম হবে। তোমরা জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে মারা যায়, সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায়, সেও শহীদ। আবার কেউ পেটের ব্যথায় মারা গেলে সেও শহীদ'।[৪০]

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر-

৫. ফুযালা ইবনু ওবায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারারত অর্থাৎ দ্বীন হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কবরের ফিৎনা হতেও সে নিরাপদে থাকবে'।[৪১]

عن المقداد بن معديكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويـزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه-

৩৯. ***মুসলিম, মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৮০৬, ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৬৩২।
৪০. ***মুসলিম, মিশকাত*** হাদীছ নং ৩৮১১; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৩৭।
৪১. ***তিরমিযী, আবুদাউদ*** হা/২৫০০, হাদীছ ছহীহ; ***দারেমী, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৮২৩; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৪৮।

৬. মিকদাদ ইবনু মা'আদী কারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে জান্নাতের মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষ দেখানো হয়। (২) কবরের আযাব হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৩) ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৪) তার মাথায় ইয়াকূত নির্মিত সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও উহার মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হতে উত্তম। (৫) তার স্ত্রী হিসাবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হূর দেওয়া হবে। (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য ৭০ জনের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে'।[৪২]

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شئ أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله، وأما الاثران فاثر في سبيل الله واثر في فريضة من فرائض الله تعالى

আবু উমামা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চাইতে কোন জিনিস এত প্রিয়তম নেই। দু'টি ফোঁটার একটি হল আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে চক্ষু হতে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা। আর দ্বিতীয়টি হল আল্লাহ্র পথে প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর চিহ্ন দু'টির একটি হল আল্লাহ্র রাস্তায় শরীরে আঘাত বা ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টি হল আল্লাহ্র ফরয সমূহের কোন একটি ফরয আদায় করার চিহ্ন'।[৪৩]

عن أبي موسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى اصحابه فقال اقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فالقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের দরজা সমূহ মুজাহিদের তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে এক জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মূসা! আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন? আবু মূসা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি তার সাথীদের নিকট এসে বলল, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারের খাপ

---

৪২. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত*, হাদীছ নং ৩৮৩৪; *বঙ্গানুবাদ মিশকাত*, হাদীছ নং ৩৬৫৯।
৪৩. *তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত*, হাদীছ নং ৩৬৬১।

ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল। উহা দ্বারা অনেক শত্রুকে হত্যা করল এবং শেষে নিজেও শত্রুদের আঘাতে শহীদ হল'।[৪৪]

ওতবা ইবনু আবদ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জিহাদে যে সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করে তারা তিন প্রকার। (১) খাটি মুমিন যে স্বীয় জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে। শত্রুর সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন প্রাণপণে লড়াই করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এই শহীদ আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এমন শহীদ আরশের নিচে আল্লাহ্‌র তাবুতে অবস্থান করবে। ঐ সমস্ত শহীদদের চেয়ে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা কেবল নবুওতের মর্যাদা ব্যতীত কোন দিক দিয়ে বেশী হবে না। (২) যে মুমিন তার আমলকে ভাল ও মন্দের সাথে মিশ্রিত করে। অতঃপর নিজের জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হয় তখন প্রাণপণ লড়াই করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এ ধরনের শাহাদত হল পবিত্রকারী, যা গুনাহ-খাতাকে মুছে দেয়। বস্তুতঃ তলোয়ার হল গুনাহ খাতা মোচনকারী। ফলে এ ধরনের শহীদ জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (৩) আর তৃতীয় প্রকার শহীদ হল মুনাফিক, যে নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। অতঃপর যখন শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন লড়াই করে নিহত হয়। অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলা না করে নিজেই নিতহ হয়। মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তির ঠিকানা হল জাহান্নাম। কেননা তলোয়ার নিফাককে মিটায় না'।[৪৫]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহিদ পূর্ণ ঈমানের সাথে আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হলে তার আশ্রয়স্থল জান্নাত। তবে যে ব্যক্তি লড়াই না করে শুধু শহীদ হওয়ার আশায় নিহত হয় কিংবা নিজের বীরত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়, তার আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম।

অমুসলিমদের সাথে কখন যুদ্ধ বৈধ

কোন অমুসলিমকে অহেতুক হত্যা করা হারাম; বরং তাদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হতে বের করে দেয় না, এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন' *(মুমতাহিনা ৮)*।

---

৪৪. ***মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৬৭৬।
৪৫. ***দারেমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৬৮৩, সনদ ছহীহ।

তবে যদি তারা অত্যাচার করে অন্যায়ভাবে বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা জায়েয *(হজ্জ ৩৯, মুমতাহিনা ৮)*। প্রকাশ থাকে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে। (১) প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। (২) ইসলাম গ্রহণ না করলে (জিযিয়া) কর দেয়ার জন্য বলতে হবে। কর দিতে রাযী হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। (৩) কর দিতে অস্বীকার করলে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।[৪৬] এই যুদ্ধের ঘোষণা দেবেন দেশের সরকার। কোন ব্যক্তি বা দল যথেচ্ছা এ যুদ্ধের ঘোষণা দিতে পারে না।

অমুসলিমদের সাথে রাসূলে করীম (ছাঃ) ভাল ব্যবহার করতেন এবং তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। আয়লা নামক জনৈক অমুসলিম বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটি খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন।[৪৭] ওমর (রাঃ) এক অমুসলিম ব্যক্তিকে একটি কাপড় উপহার দিয়েছিলেন।[৪৮] অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অজ্ঞাতভাবে হত্যা করাতো দূরের কথা কোন অমুসলিমকেও জ্ঞাত-অজ্ঞাত কোন অবস্থায় হত্যা করার কোন অবকাশ ইসলামী শরী'আতে নেই। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। কোন অমুসলিম দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা করার পরিকল্পনা করলে, মুসলমানরা তাদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। মোকবিলার পদ্ধতি সম্পর্কে সুলাইমান ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল তিনি যখন কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন তখন তাকে একান্তভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার এবং সঙ্গীদের সাথে ভাল আচরণ করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে যাও। আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। সাবধান জিহাদে যাও কিন্তু গণীমতের মালে খিয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ করো না অর্থাৎ তাদের হাত, পা, নাক, কান কর্তন করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। যখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষ মুশরিক কাফির শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তুমি তাদেরকে তিনটি প্রস্তাব দিবে। তিনটি প্রস্তাবের কোন একটি মেনে নিলে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং তাদের প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে। প্রথমতঃ যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তাদের মুসলিম বলে মেনে নিবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকবে। তাদেরকে কাফেরদের দেশ হতে মুসলমানদের দেশে হিজরত করে চলে আসার আহ্বান জানাবে। তাদেরকে এটাও অবগত করবে যে, তারা যদি হিজরত করে, তবে তারাও সে সমস্ত

---

৪৬. ***বুখারী, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৯২৯।
৪৭. ***বুখারী,*** ১ম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ।
৪৮. ***বুখারী,*** ১ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ।

অধিকার ও সুযোগ লাভ করবে যা মুহাজিরগণ লাভ করেছে। আর সে সমস্ত দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত হবে, যা মুহাজিরদের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু যদি তারা নিজ দেশ ত্যাগ করতে রাযী না হয়, তখন তাদেরকে অবহিত করবে, যে তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে যেরূপ আচরণ গ্রাম্য মুসলমানদের সাথে করা হয়। অর্থাৎ তারা ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, ক্বিছাছ ও দিয়াত ইত্যাদি বিধান মেনে চলবে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল ও বিনা যুদ্ধে কাফেরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল হতে তারা কোন অংশ পাবে না। অবশ্য তারা এ সম্পদের অংশ তখনই পাবে, যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শামিল হবে। দ্বিতীয়ত যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন তাদের নিকট হতে জিযিয়া বা কর আদায়ের প্রস্তাব পেশ করা হবে। যদি তারা কর দিতে রাযী হয়, তুমি তাদের কর গ্রহণ করবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে। তৃতীয়ত যদি তারা জিযিয়া বা কর দিতে অস্বীকার করে তাহলে তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে'।[৪৯]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে যুদ্ধের ময়দানেও কোন অমুসলিমকে হত্যা করা জায়েয নয়। ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে জিযিয়া দিয়ে বেঁচে থাকার প্রস্তাব দিতে হবে। জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যুদ্ধে মুসলমানদের জয়-পরাজয় উভয়েই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন না। এখানে প্রত্যেককে একান্তভাবে চিন্তা করতে হবে যে, একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যদি কেবল যুদ্ধের ময়দানে ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয না হয়, তাহলে একজন মুসলিমকে কি করে হত্যা করা জায়েয হতে পারে?

৪৯. ***মুসলিম, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৯২৯; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত*** হাদীছ নং ৩৭৫৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ : সন্ত্রাসের পরিচয়, কারণ ও প্রতিকার

সন্ত্রাসের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : ‘সন্ত্রাস’ শব্দটি ‘ত্রাস’ থেকে উদ্ভূত। ত্রাস অর্থ হ’ল ভয়, ভীতি, শংকা।[৫০] আর সন্ত্রাস অর্থ হচ্ছে মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়[৫১] আতংকগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৫২] সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হ’ল- Terror, Extreme fear- যৎপরোনাস্তি আতংক, সন্ত্রাস ইত্যাদি। আর Terrorism হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি, সন্ত্রাসবাদ। Terrorist অর্থ সন্ত্রাসী। Terrorize সন্ত্রাসিত করা, ভয় দেখিয়ে শাসন করা।[৫৩] সন্ত্রাসের আরবী প্রতিশব্দ হল- ارهاب، رهب، رعب، ইত্যাদি।[৫৪] اَلْإِرْهَابُ (আল-ইরহাব) অর্থ কাউকে ভয় দেখানো বা সন্ত্রস্ত করে তোলা।[৫৫] পবিত্র কুরআন মাজীদে ভয় অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[৫৬]

পারিভাষিক অর্থ : পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস হ’ল যে কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা।[৫৭]

১. যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী বলেন, الإرهاب كلمة مبني لها معنى ذو صور متعددة يجمعها الاخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة والترويع إلى ازهاق الأنفس البريئة واتلاف الأموال المعصومة أو نهبها، وهتك الأعراض الوصونة وشق عصا الجماعة. ‘ইরহাব (সন্ত্রাস) একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ, যার অনেক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে শামিল হচ্ছে- নিরপরাধ নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখানো ও শঙ্কিত করা। কখনো নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার

---

৫০. ***বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*** (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ: ১৯৯২), পৃঃ ২৬৬।
৫১. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত ***বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*** (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ: ১৩৯৯/১৯৯২ইং), পৃঃ ১০২৪।
৫২. ***সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*** (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২২তম মুদ্রণ: ১৯৯৮খৃঃ), পৃঃ ৬৬১।
৫৩. ***Bangla Academy Bengali-English Dictionary***, (Dhaka : Bangla Academy Dhaka, 1st Edi. 1401/1994), p.786; ***Samsad English-Bengali Dictionary*** (Calcutta : Sahitya Samsad, 1980), P. 1168.
৫৪. আবু তাহের মেসবাহ সম্পাদিত ***আল-মানার বাংলা-আরবী অভিধান*** (ঢাকা : মোহম্মাদী লাইব্রেরী, ১৯৯০ইং), পৃঃ ১২৪২।
৫৫. ***আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব*** (দিল্লী : দারু লিইশাআতিল ইসলামিয়াহ, তাবি), পৃঃ ৩৭৬।
৫৬. সূরা বাক্বারাহ ৪০; আ‘রাফ ১৫৪; আনফাল ৬০; নাহল ৫১; আম্বিয়া ৯০।
৫৭. ***সংসদ বাঙ্গালা অভিধান***, পৃঃ ৬৬১; বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃঃ ৫৪১।

সীমাহীন ভীতি প্রদর্শন, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট, সতী-সাধবী নারীর সম্ভ্রমহানি করা, মুসলিম জাতির ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা বা একতা বিনষ্ট করা'।[৫৮]

২. الموسوعة العربية العالمية গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, الإرهاب : استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الرعب– 'ইরহাব (সন্ত্রাস) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা'।[৫৯]

৩. 'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী' পরিচালিত 'ইসলামী ফিক্বহ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, العدوان الذى يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه وعقله وماله، وعرضه)– 'কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে'।

এ সংজ্ঞাটি সব ধরনের নীতিবহির্ভূত ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন, ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যে কোন ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র হামলা, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহাজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন কর্মকাণ্ডকে শামিল করে। তাছাড়া পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসাবে গণ্য হবে।[৬০]

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ও সন্ত্রাসবিরোধী কমিটি প্রদত্ত সংজ্ঞা : 'এমন কতগুলি কাজ যা সত্তাগতভাবে বিভিন্ন প্রকার অপরাধ হতে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন হত্যা, ইচ্ছাকৃত অগ্নিকাণ্ড, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি। তবে প্রথাগতভাবে এ অপরাধ বিভিন্ন রকম হয়। কেননা এটা সংগঠিত হয় রাতের আঁধারে সুশৃংখল শান্তিপূর্ণ সমাজে আতঙ্ক-ভীতি ও নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এর ফলে সমাজের শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়। সমাজের ভিত ধ্বংস হওয়ার রূপ পরিগ্রহ করে এবং সমাজে বিদ্রোহ শক্তিশালী হয়, পরমুখাপেক্ষিতা, ভীতিকর পরিস্থিতি এবং দুর্দশা বৃদ্ধি পায়।[৬১]

---

৫৮. যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী, ***আল-ইরহাব ওয়া আছারুহু আলাল আফরাদ ওয়াল উমাম*** (দাম্মাম : দারু সাবীলিল মুমিনীন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ), পৃঃ ১০।

৫৯. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলে শায়খ, আল-ইরহাব : আসবাবুহু ওয়া ওসায়িলুল ইলাজ, ***মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিয়্যাহ***, (সঊদী আরব : কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, রজব-শাওয়াল ১৪২৪ হিঃ/সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৩), সংখ্যা ৭০, পৃঃ ১০৮-১০৯।

৬০. তদেব, পৃঃ ১১৪।

৬১. ***আল-ফুরক্বান*** (কুয়েত : রবীউছ ছানী, ১৪২৯ হিজরী/এপ্রিল ২০০৮), ৪৮৬তম সংখ্যা, পৃঃ ৪১।

৫. ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ স্বীকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে 'অসৎ ও অশুভ উদ্দেশ্যে সংঘটিত প্রত্যেক অপরাধমূলক কাজ তা যেখানে, যার দ্বারা সম্পন্ন হোক না কেন তা অবশ্যই নিন্দা, তিরস্কার ও ভর্ৎসনাযোগ্য'।[৬২]

৬. ১৯৮৯ সালে আরব দেশ সমূহের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ প্রদত্ত সংজ্ঞা হচ্ছে- 'সহিংসতা সৃষ্টিকারী বা হুমকি-ধমকি প্রদানকারী এমন সব কাজ যা দ্বারা মানবমনে ভীতি-আতঙ্ক, ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। তা হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, অপহরণ, গুপ্তহত্যা, পণবন্দী, বিমান ও নৌজাহাজ ছিনতাই বা বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির যে কোনটির মাধ্যমে হোক না কেন। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘটিত যেসব কাজ ভীতিকর অবস্থা ও পরিবেশ, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে (তাও সন্ত্রাস)'।[৬৩]

৭. The New Encyclopaedia Britannica গ্রন্থে বলা হয়েছে, Terrorism, the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. 'একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করার সুসংগঠিত পন্থাই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ'।[৬৪]

৮. মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI-এর মতে, Terrorism is the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government. The civilian population or any segment there of in furtherance of political or social objectives. অর্থাৎ সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোন সরকার, বেসরকারী জনগণ বা অন্য যে কোন অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের উপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয়।[৬৫]

কোন কারণ ও উদ্দেশ্যে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি, জান-মালের ক্ষতি সাধন, দেশ ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন, স্থাপনা ও স্থাপত্য ধ্বংস এবং সর্বস্ত রের নাগরিকদের আতঙ্কিত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তাকে বলা হয় সন্ত্রাস।[৬৬]

---

৬২. كل عمل إجرامي سبب وجيه حيثما تم فعله مهما كان الفاعل فهو يستحق الشجب. দ্র: ***আল-ফুরক্বান*** ৪৮৬তম সংখ্যা, পৃঃ ৪১।

৬৩. هوكل فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد به يسبب رعبا أو فزعا من خلال أعمال القتل أو الاغتيال أو حجز الرهائن أو اختظاف الطائرات أو السفن أو تفجيرالمفرقعات أو غيرها من الأفعال مما يخلق حالة من الرعب والفوضي، والاضطراب الذي يستهدف أهدافا سياسية. দ্র: ***আল-ফুরক্বান***, এপ্রিল/০৮, ৪৮৬তম সংখ্যা, পৃঃ ৪১।

৬৪. ***The New Encyclopaedia Britannica*** (USA : 2002), Vol. 11, P. 650.

৬৫. ফোরকান আলী, সন্ত্রাসবাদ : ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার, ***দৈনিক ইনকিলাব***, ২৫ জুন ২০০৭, পৃঃ ১৪।

৬৬. ***মাসিক আল-ফুরকান*** (কুয়েত : আর.আই. এইচ. এস), ৯৭তম সংখ্যা, মে ১৯৯৮, পৃঃ ৬।

মোটকথা যে কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে ভয়-ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি করে এবং জানমালের ক্ষতি সাধন করে, তাই সন্ত্রাস এবং যে বা যারা এসকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারাই সন্ত্রাসী।

জঙ্গীবাদ : সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। ফার্সী জংগ শব্দের অর্থ লড়াই, যুদ্ধ প্রভৃতি। এই শব্দ থেকে জঙ্গীবাদ শব্দের ব্যুৎপত্তি। যারা কোন স্বার্থ হাছিলের লক্ষ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তারা জঙ্গী বলে আখ্যায়িত হয়। আর তাদের কর্মকাণ্ড জঙ্গীবাদ বলে কথিত হয়।

জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য

জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে সার্বিক দিক দিয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। হাকীকত বা প্রকৃতি, তাৎপর্য, অর্থ ও ভাব, কারণ ও প্রকারভেদ, ফলাফল ও উদ্দেশ্য এবং শারঈ হুকুমের ক্ষেত্রে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। জিহাদ বিধিবদ্ধ, শরী'আত সম্মত ইসলামের এক অমোঘ বিধান। আর সন্ত্রাস হচ্ছে ইসলামে নিন্দনীয়, ঘৃণিত, ধিকৃত ও নিষিদ্ধ।

সন্ত্রাস মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, বৈরীতা ও দুশমনী সৃষ্টিকারী, যা শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে, সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভীত-বিহ্বল করে তোলে, তাদের সম্পদ ও মান-সম্ভ্রমের উপর হামলা করে, তাদের স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, সর্বোপরি পৃথিবীতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে জিহাদ হয়ে থাকে মানুষের শান্তি-নিরাপত্তা, জান-মাল, ইয্যত-সম্মান রক্ষার লক্ষ্যে। তাছাড়া মানুষের জীবন যাত্রার স্বাধীনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, যুলুম-নির্যাতনকারীদের কবল থেকে নির্যাতিতদের উদ্ধার ও রক্ষা, শক্তিধর ও প্রভাবশালী প্রতিপক্ষ ও দখলদার সাম্রাজ্যবাদীদের হিংস্র ছোবল থেকে নিজ দেশ ও নিজ শহরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জিহাদ করা হয়ে থাকে।

শত্রুতা ও বৈরীতা সৃষ্টি, শান্তিপ্রিয় জনতাকে সন্ত্রস্ত করা, অন্যের ক্ষমতা ও শক্তি খর্ব করা বা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইসলাম কখনো মুসলিম জাতিকে দেয় না; বরং ইসলাম মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলের সাথে ঐক্য গড়ে তোলার ও সংহতি বৃদ্ধি করার, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধনকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করার নির্দেশ দেয়। আর তাদের পবিত্র স্থান সমূহ সংরক্ষণ এবং তাদের জীবন রক্ষার আদেশ দেয়। ফলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের সাথে অন্যদের শত্রুতা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যদি তাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন করা হয় তাহলে তা প্রতিহত করতে তারা সুদৃঢ় অবস্থান নেয়।

ইসলামের প্রচার-প্রসার, হক্বের সাহায্য-সহযোগিতা, অন্যায়-অনাচার ও যুলুমের প্রতিরোধ, ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জিহাদকে ইসলামে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তেমনি জিহাদকে ইসলামে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র রহমত ও আশীষ প্রতিষ্ঠার জন্য, যে রহমত সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জগদ্বাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। যাতে করে তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্টতার আঁধার ও গোমরাহীর যুলমাত থেকে হেদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন। আর সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মোটকথা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা শরী'আত সিদ্ধ ফরয। আর সন্ত্রাস হচ্ছে মানবতা পরিপন্থী এক জঘন্য অপরাধ। জিহাদ শরী'আত সম্মত, আর বৈরীতা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাস হচ্ছে নিষিদ্ধ। জিহাদ হয় স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ হল দুনিয়ার জন্য।[৬৭]

সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব

সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে ইহুদীরা বিভিন্ন উৎসবে, জনবহুল স্থান কিংবা বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে রোমান দখলদারদের হত্যা করত। তারা রোমান দখলদার, তাদের ইহুদী দোসর ও সহায়তাকারীদের প্রতি এসব গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন হুমকি ও ত্রাস ছড়িয়ে দিত। ১০৯০ সাল থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ক্রুসেডের সময়ও গুপ্ত ঘাতকরা একই কৌশল অবলম্বন করেছিল। ফ্রান্সে ১৭৮৯-৯৯ সালে 'ফরাসি বিপ্লব' চলাকালীন সময়ে আধুনিক সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয় বলা যায়। এর পূর্ব পর্যন্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কেবল ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার নিরিখে পরিচালিত হত। অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা, জাতীয়তাবাদ, মার্ক্সবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসারের পাশাপাশি সন্ত্রাসের চেহারা ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে।[৬৮] এ সময়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও জনপ্রিয় শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে The Regime de la Terreuri নামে একটি বিশেষ পরিষদ গঠন করা হয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের কারণে সহিংসতা বেড়ে গেলে এ পরিষদ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তখন থেকেই মানুষের মনে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়। এসব নেতিবাচক কার্যকলাপ যারা পরিচালনা করে তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ শব্দটি তেমন প্রসার লাভ করেনি।[৬৯] ফরাসি বিপ্লবের শেষ দিকে ও ১৮৭৮-৮১ সালে রাশিয়ায় গণসংগঠনের দ্বারা আধুনিক সন্ত্রাসবাদ প্রধানত রাজতন্ত্র বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে। বিপ্লবীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের

---

৬৭. ড. আবদুর রহমান ইবনু মা'লা আল-লুআইহিক্ব, আল-ইরহাব ওয়াল গুলূ, ***আল-ফুরক্বান*** (কুয়েত : ২০০৮), ৪৮৮ তম সংখ্যা, পৃঃ ৪৩।
৬৮. ***দৈনিক ইনকিলাব***, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃঃ ১৫।
৬৯. ফোরকান আলী, সন্ত্রাসবাদ : ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার, ***দৈনিক ইনকিলাব***, ২৫ জুন ২০০৭, পৃঃ ১৪।

ঐ সরকার বিরোধী অবস্থান পরবর্তী সন্ত্রাসবাদীদের জন্য মডেল হিসাবে অনুসৃত হয়। রাষ্ট্রীয় শোষণের কাজে ব্যবহৃত বা প্রতিনিধিত্বকারীদেরকে বিপ্লবীরা লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নিত এবং তারা রাষ্ট্রীয় বৈষম্যকে জনগণের নিকট উপস্থাপন করতে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালাত।[৭০] উনিশ শতকের শেষে রুশ বিপ্লবীরা যখন জার রাজবংশের শাসনের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু করে, তখন থেকে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।[৭১] এসময়ে জনৈক সন্ত্রাসবাদী সদস্য ১৮৮১ সালের মার্চে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করে। এরপর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতে থাকে।[৭২]

১৯১৪ সালে এক বসনীয় সার্ব তরুণ বসনিয়ায় অস্ট্রিয়ান শাসন অবসানের লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ান আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দকে হত্যা করে। এ ঘটনাই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়। এই তরুণের জঙ্গী ছাত্র গ্রুপের সাথে অস্ট্রিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাসবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দিত। সার্বিয়া তাদেরকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা সহায়তা করত। ১৯২০-৩০ এর দশকে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে সন্ত্রাসবাদ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ে নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিবাদী ইতালী ও সর্ববাদী সোভিয়েতের বেপরোয়া ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ বোঝাতে 'টেরোরিজম' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। বর্তমান সময়ের ইতিহাসে ১৯৭০-এর দশকে আর্জেন্টিনা, চিলি ও গ্রীসের সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনেও একই চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। তবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বাইরে যারা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতো সাধারণত তাদের ক্ষেত্রেই 'টেরোরিজম' (Terrorism) শব্দটি বেশী ব্যবহার করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাবেক বিপ্লবী সংগঠনগুলোই পুনরায় সন্ত্রাসবাদী ধারার প্রত্যাবর্তন করে। ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী এবং ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগঠনগুলোর দ্বারা সৃষ্ট 'ভায়োলেন্স'কে সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো। তৎকালীন সময়ের সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী ঘটনা হচ্ছে ১৯৪৬ সালে প্যালেস্টাইনে বৃটিশদের সামরিক প্রশাসনের হেডকোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহৃত জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে 'ইরগুন জাই লিউমি' নামক ইহুদী জঙ্গী সংগঠন পরিচালিত বোমা হামলার ঘটনা। ইরগুনের তৎকালীন কমান্ডার মেনাচিম বেগিন পরবর্তীতে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৮ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

১৯৬০ দশকের শেষ দিক থেকে '৭০ দশক পর্যন্ত অবরুদ্ধ বা নির্বাসিত বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তাদের দুর্ভোগ ও দুরবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি

৭০. *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃঃ ১৫।
৭১. *ঐ*, ২৫ জুন ২০০৭, পৃঃ ১৪।
৭২. *ঐ*, ২১ জুলাই ২০০৭, পৃঃ ১৪।

আকর্ষণ ও সমর্থন লাভের জন্য সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। ১৯৬৮ সালের ২২ জুলাই 'পপুলার ফ্রন্ট ফর লিবারেশন প্যালেস্টাইন' (পিএফএলপি)-এর তিনজন সশস্ত্র মুজাহিদ একটি ইসরাঈলী আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের বাণিজ্যিক বিমান ছিনতাই করে আন্তর্জাতিক একটি সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। '৭০-এর দশকে আরো একটি প্রবণতা লক্ষণীয় যে, এ সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক চরমপন্থীরা সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করে এবং ভিয়েতনামে মার্কিন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তারা আধুনিক ধনবাদী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধাচরণের নামে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়। জার্মানীর নাৎসীবাদের 'মেইন হোফ গ্যাং' এবং ইতালীর 'রেড ব্রিগেড' নামের সংগঠন এবং '৭০-এর শেষ দিকে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে 'লেফট উইং ভায়োলেন্স'-এর জবাবে 'নিও নাজি' ও নিও ফ্যাসিস্টদের 'রাইট উইং' সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।[৭৩]

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাংগঠনিকভাবে প্রথম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু হয় ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে। যেসব সংগঠন সে সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় তন্মধ্যে 'হাগনাহ', 'লোহামে হেরাত ইসরাঈল' বা 'স্টার্নগ্যাং' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'ইরগুন জাই লিউমি'ও ছিল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। ইসরাঈলের এক সময়কার প্রধানমন্ত্রী মেনাচিম বেগিন ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠা করে ইরগুন। আইজ্যাক শামিরও এই গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য ছিল। চল্লিশের দশকে এসব সংগঠন আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চরম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল। হাগনার দুই সদস্য মিসরের কায়রোয় আবাসিক ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড ময়েনকে খুন করেছিল।[৭৪]

উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদ চলে আসলেও স্বতন্ত্রপন্থা ও মতাদর্শরূপে সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল করে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সেখানে ২,৩৭৯ টি সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হয়। যা ছিল সারা বিশ্বের সন্ত্রাসী ঘটনার ৩৬.৭৫ শতাংশ। বিশ্বের শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের কারণে মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশেও চরমপন্থীদের উদ্ভব ঘটে।[৭৫]

সন্ত্রাসের দায় কি শুধু মুসলমানদের?

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুনভাবে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ চলছে। ইসলামকে সহিংস ও সন্ত্রাসী ধর্ম এবং মুসলিম

---

৭৩. জামাল উদ্দীন বারী, সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস : আত্মঘাতী হামলা ও একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ***দৈনিক ইনকিলাব,*** ১৪ ডিসেম্বর, পৃঃ ১৫।
৭৪. আলফাজ আনাম, মার্কিন গণমাধ্যম : প্রচারণা স্টাইল, ***দৈনিক নয়াদিগন্ত,*** ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, পৃঃ ৮।
৭৫. ***মাসিক আল-ফুরকান,*** ১০১ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃঃ ৬।

জাতিকে সন্ত্রাসী জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে নির্মূল করার এক সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা চলছে বিশ্বব্যাপী। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের দিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার পর মুসলমানরা এ হামলা করেছে বলে সারা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি করা হল। কিন্তু অদ্যাবধি বিষয়টির কোন সুষ্ঠু ও যথাযথ তদন্ত হল না। হামলা কারা করেছে তাও প্রমাণিত হল না। অথচ এই হামলার অজুহাতে দখল করে নেওয়া হল স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম ভূ-খণ্ড আফগানিস্তানকে। ইরাকে জীবাণু অস্ত্র রয়েছে, এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে দেশটির উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে রাখা হল ১০ বছর যাবৎ। যার ফলে বিনা চিকিৎসায় ও শিশুখাদ্যের অভাবে তথাকথিত মানবাধিকারের রক্ষক বিশ্বমোড়লদের চোখের সামনে নিহত হল লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ইরাকী শিশু। শুধু তাই নয়, ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার ডাহা মিথ্যা অজুহাত তুলে দখল করে নেওয়া হল মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির হাজার বছরের লীলাভূমি এই দেশটিকে। নির্বিচারে লাখ লাখ নিরীহ নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরানো হল, মা-বোনেরা নির্যাতিত হল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মহোৎসব চালাল, আর বিশ্ববিবেক কেবল তা নীরবে প্রত্যক্ষ করল।

একইভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করে তারা নাইজেরিয়ার গ্যাস লুট করেছে, সুদানের তেলসম্পদ গ্রাস করেছে, আইভরিকোস্টের স্বর্ণ ও হিরক লুণ্ঠনে মেতে উঠেছে। ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, কাশ্মীর, গুজরাট, উজবেকিস্তান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া সর্বত্র মুসলিম জাতি নির্যাতিত, নিপীড়িত হয়েছে ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা। সম্প্রতি তারা ইরানের দিকেও তাদের কালো হাত প্রসারিত করার ফন্দি আঁটছে। তাদের ষড়যন্ত্রে দেশে দেশে মুসলিম জনগণ জীবন দিচ্ছে, তাদের বোমার আঘাতে মুসলিম ভূ-খণ্ড জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে, তাদের বুলডোজারের নীচে ফিলিস্তীনী শিশুদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের অমানুষিক নির্যাতনের ফলে কিউবার গুয়ান্তানামো বে ও ইরাকের আবু গারীব কারাগারে বন্দীদের গগণবিদারী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। কিন্তু কেউ তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করছে না; বলছে না মানবাধিকার লংঘনকারী। অথচ মুসলমানরা কোথাও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করলেও তাদেরকে বলা হয় সন্ত্রাসী, জঙ্গী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি। এটা স্রেফ মুসলিম জাতির প্রতি বিদ্বেষের ফলে ঘটছে।

এবার আমরা ইতিহাসের আলোকে বিষয়টি আরো একটু খতিয়ে দেখতে চাই যে, সন্ত্রাসের অভিযোগ শুধু মুসলিম জাতির উপর করা কতটা যুক্তিযুক্ত? ১৭৯০ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের 'জেকোবিন পার্টি' কর্তৃক সে দেশের শাসন ব্যবস্থাকে 'রেন অব টেরর' বা 'সন্ত্রাসের শাসন' বলা হত। ১৭৯০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এটা অব্যাহত ছিল। তারা হাজার হাজার বিরুদ্ধবাদীদেরকে গিলোটিনে হত্যা করে। ৫ লাখ

মানুষকে গিলোটিনে কোন না কোন শাস্তি দেওয়া হয় এবং ৪০ হাজার লোককে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। ১৮৮১ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে 'এনারকিস্টরা' জারকে হত্যা করে। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে 'হে মার্কেটে' শ্রমিক র‍্যালিতে 'এনারকিস্ট'দের সন্ত্রাসী হামলায় ১২ জন লোক নিহত হয়। এরপর ১৯০১ সালের জুনে সারায়েভোতে অষ্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক অমুসলিমদের হাতে নিহত হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯২৫ সালের ১৬ এপ্রিলে বুলগেরিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি সেদেশের রাজধানী সোফিয়ার গির্জাতে বোমা হামলা চালিয়ে ১৫০ জন লোককে হত্যা করে। ১৯৩৪ সালের ৯ অক্টোবর যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্ডার সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন।

১৯৬৮ সালে গুয়াতেমালাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিহত হন। ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমার ফেডারেল ভবনে বোমা হামলায় ১৬৬ জন নিহত হয়। এই হামলা চালিয়েছিল দক্ষিণপন্থী একটিভিস্ট, টিমোসি ও টেরি। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই ৮ বছরে ইহুদীরা ২৫৯টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটায়। এসব ঘটনায় ইরগুন, স্টার্নগ্যাং ও হাগনাহ নামক ইহুদী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো জড়িত ছিল।

১৯৪৬ সালে ইহুদী সন্ত্রাসীরা জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে আরবদের পোশাক পরে বোমা হামলা চালায়। এতে ৯১ জন লোক নিহত হয়। এ হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিল মেনাচিম বেগিন, যে পরবর্তীতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় এবং শান্তিতে নোবেল পুরস্কারও লাভ করে। ১৯৬৮-১৯৮২ সাল পর্যন্ত এই ১৫ বছরে জার্মানীতেও বহু সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হয়। ইটালীর সন্ত্রাসী সংগঠন হচ্ছে 'রেড ব্রিগেড' এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাপানিজ 'রেড আর্মি' ও 'ওমশিনরিকো' জাপানের সন্ত্রাসী সংগঠন। বৌদ্ধ 'কাল্ট' দর্শনে অনুপ্রাণিত 'ওমশিনরিকো' টোকিওর পাতাল রেলে নার্ভগ্যাস ব্যবহার করে বহু লোককে হতাহত করে। ১৯৭২ সালে আইআরএ তিনটি বোমা হামলা চালায়। এরপর ১৯৭৪ সালে তারা ২ বার হামলা চালায় এবং ১৯৯৬ সালে ম্যানচেষ্টার শপিং এলাকাতে তাদের হামালায় ২ জন লোক নিহত হয়।

১৯৯৮ সালে তারা ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এই আইআরএ একশত বছর যাবৎ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০১ সালে এরাই বিবিসি ভবনে বোমা হামলা চালায়। ক্যাথলিক আইআরএ বিভিন্ন ঘটনায় শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। তবু তাদেরকে 'ক্যাথলিক সন্ত্রাসী' বলা হয় না; যদিও মুসলমানদেরকে 'ইসলামী সন্ত্রাসী', 'ইসলামী জঙ্গী' বলা হয়ে থাকে। এই আইআরএ স্পেন ও ফ্রান্সেও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়। 'লর্ডস স্যালভেশন আর্মি' নামক সংগঠন আফ্রিকায় সন্ত্রাস করে। তারা ধর্মের নামে সেদেশের বালক-বালিকাদের সন্ত্রাসের ট্রেনিং দেয়।

ভারতে সন্ত্রাস দমনে 'টাডা' আইন করা হয়। ১৯৮৫ সালে এই আইনে ৭৫ হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে ৭২ হাজার লোককে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা নির্দোষ হওয়ায় তাদের প্রতি কোন মামলাও দায়ের করা হয়নি। তারপরে প্রণীত হয়

'পোটা' নামক সন্ত্রাসবিরোধী আইন। কিন্তু দু'টি আইনের কোনটিতেই সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। এছাড়া ভারতে নিরাপত্তার নামে এনকাউন্টারে যে কাউকে হত্যা করা যায়। এভাবে সেখানে জনগণের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট' নামে পূর্ব ভারতে চলছে অত্যাচার-নির্যাতন। এসব কি সন্ত্রাস নয়? যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা হামলা চালিয়ে যে লক্ষ লক্ষ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করল সেটা কি সন্ত্রাস নয়? যুক্তরাষ্ট্র যখন বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন জর্জ ওয়াশিংটনকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছিল।[৭৬] এসব ঘটনার পরেও মুসলিম জনসাধারণকে কেবল সন্ত্রাসী, জঙ্গী ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ।

ভারতের ভূপালে ইউয়িন কার্বাইড হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে যে ক্ষতি সাধন করল সেটা কি সন্ত্রাস নয়? এছাড়া ভারতে মাওবাদী উলফা সন্ত্রাসীরা রয়েছে। নেপালেও মাওবাদী সন্ত্রাসী বিদ্যমান। তাছাড়া ২০০২ সালে গুজরাটে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে গণহত্যা সংঘটিত হয়, যাতে ৫ সহস্রাধিক মুসলিমকে হত্যা করা হয় এবং হাজার হাজার মুসলিম মহিলাদেরকে তাদের স্বামী সন্তানদের সামনে ধর্ষণ করা হয়। গুজরাটের এই গণহত্যায় টুইন টাওয়ারে নিহত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি মুসলিম নিহত হয়।

সম্পূর্ণ অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত The Concord Encyclopaedia গ্রন্থে উল্লিখিত সাম্প্রতিক কালের সাতটি অতি বিপজ্জনক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হচ্ছে- Japanese Red Army, Palestinian Black September Group, German Baader-Meinhop Gang, Italian Red Brigades, Urugayan Tupamoros, USA Weatherman ও Al-Qaida. এর মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি গ্রুপ মুসলমানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উক্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করেই ইসরাঈলের জঘন্য হিংসাত্মক অমানবিক কার্যকলাপ এবং কাশ্মীর, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও চেচনিয়ায় মুসলিম নিধনযজ্ঞকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডরূপে চিহ্নিত করেনি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও আপত্তিকর যে, গুটিকতক পথচ্যুত মুসলিম নামধারী লোক কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে ইসলামী সন্ত্রাস বলে অভিহিত হয়। অথচ অধিকতর ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা জড়িত থাকলেও তারা কখনও ইহুদী সন্ত্রাসী, খৃষ্টান সন্ত্রাসী, হিন্দু সন্ত্রাসী বা বৌদ্ধ সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত হয় না। এ প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ ২০০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Terrorism and The Real Issue' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, Adlof Hitler's massacre of six million Jews during World War II ranks as the most heinous of crimes against humanity in the 20th century. And now we are witnessing the mass-killings of Albanians in Kosovo, which was preceded by the massacre of hundreds of thousands of

৭৬. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২১ জুলাই'০৭, পৃঃ ১৪।

Muslims in Bosnia-Herzegovina. Yet all these acts by ethnic Europeans are never described as European or Christian terrorism.

Buddhists have thrown up a number of terrorists as witnessed by the killings perpetrated by a shadowy Japanese Buddhist cult. Hindus have massacred Muslims off and on in India. In Palestaine, civilians, including children are being shot and killed everyday by Israelis. Everyday Palestinians face the possibility of being killed.

But acts of terrorism or even simple self-defence by Muslims in Palestine are invariably described as Muslims terrorism. Terrorism by others, by ethnic Europeans, by intolerant Christians and Jews and by Buddhists are never linked to their religions. There are no Christian terrorists or Jewish terrorists, Hindu terrorists or Buddhists terrorists or Orthodox Christian terrorists, which the Serbs no doubt are'.

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এডলফ হিটলার কর্তৃক ৬ মিলিয়ন ইহুদী হত্যা বিংশ শতাব্দীতে মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ এবং বর্তমানেও আমরা কসোভোর বুকে আলবেনিয়ানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা প্রত্যক্ষ করছি, যার কিছু পূর্বে বসনিয়া-হার্জেগোভিনাতেও শত-সহস্র মুসলিম গণহত্যার শিকার হয়েছে। অথচ ইউরোপীয়ানদের দ্বারা সংঘটিত এ সকল কর্মকাণ্ড কখনই ইউরোপীয় বা খৃষ্টীয় সন্ত্রাস হিসাবে বর্ণনা করা হয় না।

বৌদ্ধদের মধ্যেও সন্ত্রাসী দেখা যায়। যার প্রমাণ শ্যাডই জাপানী বৌদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠী পরিচালিত হত্যাকাণ্ড। ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রায়শই গণহত্যা চালায়। ফিলিস্তীনে শিশুসহ সাধারণ নাগরিকরা প্রতিদিনই ইসরাঈলীদের হাতে গুলি খাচ্ছে এবং নিহত হচ্ছে। প্রতিদিনই তাদেরকে নিহত হবার শংকা মুকাবিলা করতে হচ্ছে। কিন্তু এই সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া ফিলিস্তীনী মুসলমানদের এমনকি সাধারণ আত্মরক্ষামূলক তৎপরতাকেও ব্যতিক্রমভাবে চিত্রিত করা হয় মুসলিম সন্ত্রাসবাদ হিসাবে। এই সন্ত্রাস যখন সংঘটিত হয় অন্যদের দ্বারা, হোক তারা এথনিক ইউরোপীয়, অসহিষ্ণু ইহুদী, খৃষ্টান কিংবা বৌদ্ধ, তাদেরকে কখনই স্বীয় ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না। কোন সন্ত্রাসবাদী এমন নেই হোক সে খৃষ্টান বা ইহুদী, হোক সে হিন্দু বা বৌদ্ধ কিংবা অর্থডক্স খৃষ্টান, যারা সন্দেহাতীতভাবে তা করেছিল'।

মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত ফিলিস্তীনের কিশোর ও বালকরা যখন অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে পাথর ছুঁড়ে মারে তখন তা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসাবে অভিহিত হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক ফিলিস্তীনীদের পাথরের জবাবে যখন প্রশিক্ষিত ও প্রাপ্তবয়স্ক ইসরাঈলী সৈন্যরা নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে তখন তা SELF-DEFENCE বা আত্মরক্ষা বলে আখ্যায়িত ও সমর্থিত হয়। 'যত দোষ নন্দঘোষে'র মত সব দোষ ও অভিযোগ চাপানো হয় মুসলিম উম্মাহ্র উপর। এজন্য কবি দুঃখ করে বলেছেন,

وہ قتل بھی کردیں تو شور بھی نہیں ہوتا

ہم آہ کریں تو بدنام ہوتا.

‘ওহ্ কতল ভি কর দে, তো শোর নেহী হোতা,
হাম আহ্ করে, তো বদনাম হোতা’।

‘তারা (বিধর্মীরা) হত্যাকাণ্ড ঘটালেও কোন টুঁ শব্দ হয় না। কিন্তু আমরা (মুসলমানরা) ‘আহ্’ শব্দ করলেও বদনাম হয়’।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের কিছু চিত্র আমরা এখন মিসরের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী মুহাম্মাদ কুতুবের ভাষায় উল্লেখ করতে চাই। তিনি লিখেছেন, ‘স্পেনে যেসব ইনকুইজিসন (খৃষ্ট ধর্মীয়) আদালত স্থাপিত হয়েছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে সে দেশ থেকে উৎখাত করা। ঐ সকল কোর্টের মাধ্যমে সেখানে মুসলমানদের উপর যে ধরনের অত্যাচার করা হয়েছিল, এর আগের ইতিহাসে তার নজির মেলে না। তারা জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছিল, আঙ্গুলের নখ টেনে তুলেছিল, চোখ খুঁচিয়ে তুলে ফেলেছিল এবং হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে একে কেটে ফেলেছিল। এ ধরনের নির্যাতনের দ্বারা তারা লোকদেরকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। খৃষ্টানদের প্রতি কি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এ ধরনের অত্যাচার হয়েছে? ইউরোপের অন্যান্য এলাকায়ও মুসলমানদেরকে অনুরূপভাবে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও রুশ শাসনাধীন অন্যান্য দেশে মুসলিম নিধনযজ্ঞ ঘটেছে। উত্তর আফ্রিকা, সোমালিয়া, কেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় শাসনাধীন দেশেও অত্যাচার কম হয়নি। ভারত, মালয় প্রভৃতি দেশও এদিক দিয়ে বাদ পড়েনি। এ সকল এলাকায় নির্যাতন চালানো হয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে’।[৭৭]

ইসলাম ও মুসলমানরা অন্যদের উপর সন্ত্রাস করেনি; বরং অন্যরাই মুসলমানদের উপর চরম সন্ত্রাস করেছে, এখনও করছে। ইসলামকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। **১৯৭৯** সালের **১৬** এপ্রিল ‘টাইম ম্যাগাজিনে’ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, **মাত্র দেড়শত বছরের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ৬০ হাজারেরও অধিক বই লেখা হয়েছে।** হিসাব করলে দেখা যাবে প্রতিদিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে।[৭৮] অথচ মুসলানদেরই এক শ্রেণীর ধর্মত্যাগীরা ইসলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদেরকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করছে মিডিয়ার মাধ্যমে।

---

৭৭. ***ইসলাম দি মিস আন্ডারস্টুড রিলিজিয়ন,*** পৃঃ ৩১২-৩১৩।
৭৮. ডা. জাকির নায়েক, ***সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ,*** অনুবাদ : এম. হাসানুজ্জামান ও মোঃ সফিউল্লাহ (ঢাকা : পিস পাবলিকেশন, ২০০৮), পৃঃ ৩১।

কিছু অমুসলিম ও তাদের কিছু রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাস করে তখন তাকে সন্ত্রাস বলা হয় না; বরং বলা হচ্ছে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ। মূলতঃ ঐসব অমুসলিমদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের জায়গা-সম্পদ দখল করা। অথচ নিষ্পেষিত মুসলমানরা যখন তাদের হাতছাড়া জায়গা-সম্পদ উদ্ধারে সংগ্রাম করছে, তখন এই সংগ্রামকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাস। নীতির এই ডবল ও পরস্পরবিরোধী স্ট্যান্ডার্ড সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এই মুহূর্তে ফিলিস্তীন, ভারত অধিকৃত কাশ্মীর, ইরাক, আফগানিস্তানে মুসলমানদের উপর যা হচ্ছে তার পুরোটাই সন্ত্রাস, সম্পূর্ণ বেআইনী ও নীতিবর্জিত। মুসলমানদের মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে তাদের হৃত যমীন ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। মুসলমানরা তাই করছে। তবে হ্যাঁ, কারো বিভ্রান্তির শিকার কিছু সাধারণ মুসলমান হতে পারে। 'জেএমবি' তেমনি একটি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যেখানে সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মকর্ম পালনের পূর্ণ সুযোগ আছে, সেখানে জেএমবির সন্ত্রাস অগ্রহণযোগ্য। জেএমবির কর্মকাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্য চক্রেরই ফায়দা হবে, সুযোগ পাবে তৃতীয় বৃহত্তর এই মুসলিম রাষ্ট্রে ইরাক আফগানিস্তানের মত নাক গলাতে। তাই আমাদেরকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।

দেশে দেশে মুসলিম নির্যাতন

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের দ্বারা মুসলমানরা অবর্ণনীয় বর্বর অত্যাচার ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। পৃথিবীর কোথাও কোন অমুসলিম অত্যাচারিত হলে সারাবিশ্বের নেতারা তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন, তাকে উদ্ধারে তৎপর হন। কিন্তু কোন নিরপরাধ মুসলিম নির্যাতিত হলে মানবাধিকারের প্রবক্তারা মুখে কুলুপ এটে বসে থাকেন, টু শব্দটিও করেন না। ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির মত বৌদ্ধরাও মুসলিম নির্যাতনে পিছিয়ে নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অমুসলিম কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।-

মায়ানমার (বার্মা) : বৌদ্ধ প্রধান দেশ মায়ানমারে (বার্মায়) বিগত অর্ধ শতাব্দী বা তারও বেশী কালব্যাপী চলছে সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম নিধনযজ্ঞ ও উচ্ছেদ অভিযান। মায়ানমারের আরাকান প্রদেশে ১৯৪৭ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে সেখান থেকে ১৯ লাখ মুসলিম নাগরিককে উৎখাত করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে আরাকানে ১০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। জীবন রক্ষার তাকীদে লক্ষাধিক আরাকানী মুসলিম বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২০০০ সালে ঈদুল ফিতরের ছালাতের এক জামা'আতের উপর বৌদ্ধদের আক্রমণে ২৫ জন নিরপরাধ মুছল্লী নিহত এবং শতাধিক আহত হন। এ পর্যন্ত সে দেশে ২ হাজারের অধিক মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে আরাকান প্রদেশের ২৭টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়। এর মধ্যে ৬০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সানধি খান মসজিদও ছিল।

থাইল্যান্ড : বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাইল্যান্ডে মুসলমানদের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে, লংঘিত হচ্ছে মৌলিক মানবাধিকার। সে দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও থাই জাতীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিম জনগণের উপর চলছে অত্যাচার-নিপীড়ন। অতীতে থাইল্যান্ডে মসজিদ ছিল ২ হাজার ৫ শ'র অধিক। ১৯৯২ সালে সে সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২ হাজার ৭৮-টিতে। প্রতি বছরই বিভিন্ন অজুহাতে এসব মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে। বৌদ্ধ থাই সরকারের অধীনে মুসলিম কোন ব্যক্তির চাকুরীর কোন অধিকার ও সুযোগ নেই। সেখানে চাকুরী পেতে হলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে অথবা থাই ভাষায় নাম দিয়ে চাকুরী পেতে হয়। এস.এস.সি. স্তরের পরীক্ষায় মুসলিম নাম দেয়া হয়ে গেলে চাকুরীর উদ্দেশ্যে থাই নামে সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরীক্ষা না দিলে মুসলিম নামে তাদের পক্ষে সরকারী চাকুরী পাওয়া সম্ভব নয়। বৌদ্ধ-খৃষ্টান বেসরকারী চাকুরীদাতাদের মানসিকতা ও নীতিও অভিন্ন।

থাইল্যান্ডে মানবাধিকার বঞ্চিত মুসলমানরা ১৯৬০ সাল থেকে দক্ষিণ থাইলান্ডের পাত্তানি নামক অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কিন্তু সাফল্যের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিশ্বমোড়লরাও নীরব। অথচ অতি অল্প সময় আন্দোলন করেই খৃষ্টান অধ্যুষিত পূর্বতিমুর স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৩২ সাল থেকে থাইল্যান্ডের মালয় ভাষাভাষী মুসলমানদের ধর্মান্তরকরণ কিংবা মালয়েশিয়ায় বিতাড়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। থাইল্যান্ডে কোন মুসলিম পরিবারে কোন দম্পতির দু'টির বেশী সন্তান জন্ম নিলে তারা নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। থাই নাগরিক হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কম্বোডিয়া : বৌদ্ধ রাষ্ট্র কম্বোডিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১০ শতাংশ। খেমাররুজ পার্টি ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে এবং মুসলিম নিধনযজ্ঞ অব্যাহত রাখে। কম্বোডিয়ার মুসলিম জনগণ রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত। তারা নিরীহ জীবন যাপন করে। তারা কোন একদিকে গেলে প্রতিপক্ষ তাদের নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালায়। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তারা নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। এদিকে খেমাররুজের স্বপক্ষীয় শক্তি নয় বলে তারা মুসলমানদের উপর যে নিধন প্রক্রিয়া চালায় তাতে কম্বোডিয়ায় এখন মুসলিম জনসংখ্যা নেমে এসেছে ২ শতাংশে।

ভিয়েতনাম : ভিয়েতনামের চাম উপজাতীয় মুসলিমরা এক সময় সে দেশে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। বর্তমানে তারা জনজীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আত্মরক্ষার তাকীদে তারা হয়েছেন খৃষ্টান, কেউ কেউ হয়েছেন বাহাই সম্প্রদায়ভুক্ত। সে দেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের উপর চলছে অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক যুলুম-নির্যাতন।

চীন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, তখন চীনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশ ছিল মুসলিম। ১৯২৫ সালে চীনে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল

৫ কোটি। ১৯৯০ সালে চীনের বহুল প্রচারিত মাসিক ম্যাগাজিন 'তাই হোয়া'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী চীনে মুসলিম জনসংখ্যা ১৮ কোটি। অথচ চীন সরকার সে দেশের মুসলিমদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতেই নারাজ। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা একেক সময় একেক রকম উল্লেখ করা হয়। ১৯৯১ সালে চীনে মুসলিমরা সমগ্র জনসংখ্যার ২.৪ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়। কোন কোন সূত্র মতে, ৫.৫ শতাংশ। ১৯৪৯ সালে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর চীনের মুসলমানদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয় আরো ভয়াবহভাবে। মাদরাসা সহ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। বড় বড় মসজিদকে বিভিন্ন ধরনের অফিস, এমনকি সিনেমা হলেও পরিণত করা হয়। কমিউনিষ্ট দেশ সমূহে ইসলামী গ্রন্থ বিশেষ করে কুরআন ও হাদীছের অগ্নি উৎসব পালিত হয়। কুরআন হেফাযতের লক্ষ্যে গর্ত খুড়ে পুতে রাখা হয়, পরবর্তীকালে তার কিছু কিছু উত্তোলন করা হয়।

১৯৬৬-৬৭ সালে চীনে অনুষ্ঠিত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র একটি কর্মসূচী ছিল ইসলামী গ্রন্থাদি বিনষ্ট ও মসজিদ ধ্বংস করা। চীনে মুসলিম দলননীতি কেবল কমিউনিষ্টের সময় শুরু হয় তা নয়, বরং তাঁর পূর্বেও মুসলমানদের উপর দলন-নিপীড়ন চলতো। ১৮৭৩ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনান প্রদেশ দখলের সময়ে সমগ্র চীনে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালানো হয়। সে সময় ১ কোটি মুসলিমকে হত্যা করা হয়। সিংকিয়াং প্রদেশে বর্তমানেও মুসলমানদের উপর চলছে চরম অত্যাচার।

সিঙ্গাপুর : সিঙ্গাপুরী মুসলিমদের অধিকাংশ মালয় ভাষাভাষী। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া বিভক্তির পর মালয়েশিয়ার বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের বৃহদংশ সিঙ্গাপুরে চলে আসে। আর সিঙ্গাপুর থেকে মুসলিমগণ ক্রমশঃ উৎখাত হতে থাকে। তারা সিঙ্গাপুরী নাগরিক জীবনের মোহ পরিত্যাগ করে মালয়েশিয়ার পল্লী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া একত্রে থাকাকালে মুসলিম ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহযোগিতায় সিঙ্গাপুরে নির্মিত হয়েছিল বহু সংখ্যক মসজিদ। নানা অজুহাতে সেসব বন্ধ করে দেয়া হয়। তন্মধ্যে একটি অজুহাত হল শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের প্রয়োজনীয়তা। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চারটিরও বেশী মসজিদ ঐ একই অজুহাতে ধ্বংস করা হয়।

তিব্বত : চাইনিজ কমিউনিষ্ঠ ও বৌদ্ধদের মিলিত আক্রমণে তিব্বতের মুসলিম জনসংখ্যা বিলীন হয়ে গেছে বলা চলে। মুসলমানরা যখন চীনের সিংকিয়াং, সাংহাই পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন মরুচারী আরবদের বিরাট অংশ তিব্বতের তাপমুক্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। ১৯৫৪ সালে তিব্বতী মুসলমানরা সমূলে উচ্ছেদ হন।

শ্রীলংকা : বৌদ্ধ রাষ্ট্র শ্রীলংকায়ও মালদ্বীপের ন্যায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল আরব বণিকদের মাধ্যমে। মালদ্বীপে মোট জনসংখ্যার শতভাগ মুসলিম। শ্রীলংকায়ও জনসংখ্যার এক বৃহদংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তদানীন্তন শ্রীলংকান সরকার মুসলিম নিধন ও উৎখাত অভিযান জোরদার করে। ১৫২৬

ও ১৬২৬ সালের মাঝামাঝিতে এ অভিযান তীব্র আকার ধারণ করে। মুসলিমগণ শ্রীলংকার বিভিন্ন স্থান থেকে উৎখাত হয়ে উত্তর ও পূর্ব উপকূলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত থেকে আগত তামিলরাও এখানে বসতি স্থাপন করে। তারপর আসে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ। পর্তুগীজ এবং ডাচ ঔপনিবেশিকরা তাদের শোষণের ধারা শ্রীলংকার মুসলিম সংখ্যালঘুদের দিকেই ধাবিত করে। বৌদ্ধ নিপীড়নের সঙ্গে তামিল ও ইউরোপীয় শক্তিদের নির্যাতনের মুখে মুসলিমদের অবস্থা হয় ত্রিশঙ্কু। উক্ত ত্রিশক্তির ক্রমাগত নিপীড়নে শ্রীলংকায় ১৯৮১ সালে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ৭.৬ শতাংশ। বর্তমানে তামিল টাইগারদের আক্রোশ চলছে মুসলিমদের উপর সর্বাধিক। গেরিলা যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজনে তারা মুসলমানদের সম্পদের উপরে তাদের হিংস্র ছোবল মারছে প্রতিনিয়ত। এভাবে সরকারী বাহিনী ও তামিল গেরিলাদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নির্যাতন-নিপীড়নের নির্মম শিকারে পরিণত হচ্ছেন শ্রীলংকার নিরীহ মুসলিম জনতা। বিংশ শতকের শেষ বছরে প্রায় ২ লাখ শ্রীলংকান মুসলিম গৃহহারা হয়ে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছেন।[৭৯]

দেশে দেশে অমুসলিমদের দ্বারা মুসলমানরা নির্যাতিত হলেও বিশ্বনেতৃবৃন্দ কোন কথা বলে না। তারা থাকে নীরব-নিশ্চুপ। এমনকি এসব সন্ত্রাসীদেরকে সন্ত্রাসী বলেও কেউ আখ্যায়িত করে না। অথচ নির্যাতনে অতিষ্ঠ মুসলমানরা যদি প্রতিবাদী হয় কিংবা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ও তৎপর হয়ে সন্ত্রাসীদের যথাযথ মোকাবিলা করে তখনই তাদেরকে মুসলিম সন্ত্রাসী, জঙ্গী, চরমপন্থী ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। এটাই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের রূঢ় বাস্তবতা।

বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যা :

বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ইউরোপের বলকান উপদ্বীপের একটি মুসলিম রাষ্ট্র। বলকান তুর্কি শব্দ যার অর্থ পর্বত। সমুদ্র পরিবেষ্টিত বিশেষ বৈশিষ্ট্য এসেছে পার্বত্য উঁচু, নীচু ভূমি শ্রেণীকরণের কারণে। এ নামকরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ অঞ্চলটি এক সময় তুর্কি মুসলিম খেলাফতের অধীন ছিল। এক সময় আজকের বসনিয়া-হার্জেগোভিনাসহ গোটা পূর্ব ইউরোপই তুর্কি শাসনের অধীনে ছিল। বসনিয়া যে যুগোশ্লাভ রিপাবলিকের অধীনে ছিল তাও ১৩৮৯ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুগোশ্লাভ মুসলিম শাসনাধীনে আসার পূর্বে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা পৃথক দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তুর্কি শাসনাধীনে এ দু'টি একত্রিত হয়। তখন থেকেই সারায়েভো বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। মার্শাল টিটোর কমিউনিস্ট শাসনে মুসলমানরা ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করলে তিরস্কার করা হতো। কমিউনিস্ট শাসনে ইসলামী শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে মুসলমানদের

৭৯. এ জেড এম শামসুল আলম, বৌদ্ধ বিশ্বে মুসলিম নির্যাতন, ***দৈনিক ইনকিলাব***, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১৪।

ধর্মীয় পরিচয় না দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ অন্যায় চাপ মেনে নেননি। ফলে '৮১ সালে ৫০ জন মুসলিম নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে দেশটিকে মুসলিম কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত চলা এ বিচারের রায়ে ১২ জন মুসলিম নেতাকে ১০ থেকে ১৫ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড দেয়া হয়। যাদের মধ্যে আলীজা ইয্যত বেগোভিচও ছিলেন। স্বীয় তাহযীব-তামাদ্দুন তথা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধরে রাখার অব্যাহত লড়াইয়ের অংশ হিসাবেই ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বসনীয় মুসলমানদের স্বাধীনতার ন্যায়সঙ্গত দাবী নস্যাৎ করতে এবং জাতপাতগতভাবে মুসলিম জনগণকে নিশ্চিহ্ন করতে সার্বীয়রা চালায় ইতিহাসের বর্বরতম নারকীয় গণহত্যা ও জঘন্যতম গণধর্ষণ। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সার্বিয়ান সৈন্যরা বসনিয়ায় কমপক্ষে ২ লাখ মানুষকে হত্যা করে। আহত ও ধর্ষিত নারীদের সংখ্যা যোগ করলে এ হিসাব আরো বৃদ্ধি পাবে। একমাত্র সেব্রেনিৎসার বধ্যভূমিতে ৮ হাযার নারী-পুরুষ ও বালকের স্কেলিটন (কংকাল) পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও বসনিয়ায় মুসলিম ও ক্রোট রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ অন্যদের বেআইনী নির্যাতন, জাতীয় কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বেসামরিক লোকদের প্রতি বলপ্রয়োগে স্থানান্তর করা এবং তাদের ঘর-বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়সহ যাবতীয় সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে সার্বীয় হায়েনারা।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বসনিয়া তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে ১৯৯২ সালে সার্বীয় সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র গ্রুপগুলো হিংস্র হায়েনারূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানদের উপর। শুরু করে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যা ও গণধর্ষণ। ফলে জাতিগত লড়াইয়ের সূচনা হয়। দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ অব্যাহতভাবে পরিচালিত নারকীয়, লোমহর্ষক গণহত্যা, গণধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞে নিহত হয় ৩ লক্ষাধিক মুসলিম। পঙ্গুত্ব বরণ করে ৮ থেকে ১০ লাখ মানুষ। ইয্যত লুণ্ঠিত হয় লক্ষাধিক নারীর। অবুঝ শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ কেউই হায়েনাদের হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পায়নি। ভ্রাম্যমাণ উপগ্রহ থেকে ধারণকৃত মধ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে ১৫টি গণকবরের চিত্রাবলী সার্ব নৃশংসতার দুঃসহ স্বাক্ষর বহন করে।[৮০] বলকানের কসাই খ্যাত যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের হাতে শুধু বসনিয়াতেই দুই লাখ মুসলমান নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। ৬০ হাযার মুসলিম মা-বোন হয়েছেন গণধর্ষণের শিকার। পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়েছে ১০ লক্ষাধিক বনু আদমকে।

কসোভোর রক্তস্নাত ইতিহাস :

শতকরা ৯২ ভাগ মুসলমানের আবাসভূমি কসোভো। কসোভোর ইতিহাসও বড়ই নিষ্করুণ। কসোভোর ৪ হাযার ২শ' ৩ বর্গমাইল এলাকার ২০ লাখ মানুষের মধ্যে ১৫

৮০. ***দৈনিক ইনকিলাব***, ২৮ জুলাই ২০০৮, পৃঃ ৭; বিস্তারিত দ্রঃ মঈন বিন নাসির, ***প্যালেস্টাইন থেকে বসনিয়া*** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃঃ ২৭৫-৪৫০।

লাখ মানুষ ও যুদ্ধে বাস্তুভিটা ও সহায় সম্বল হারিয়ে পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়া, মন্টিনিগ্রো ও মেসিডোনিয়ায়ায় উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ১৩৮৯ সালের ২৮ জুন অনুষ্ঠিত 'ব্যাটল অব কসোভো'-তে সার্বীয় প্রিন্স ল্যাজারের পরাজয়ের মাধ্যমে কসোভোতে তুর্কি শাসনের সূচনা হয়। ১৪৫৫ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কসোভো। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের মাধ্যমে সার্বিয়া তুর্কিদের কাছ থেকে কসোভো পুনরুদ্ধার করে এবং ১৯১৩ সালে 'লন্ডন চুক্তির' মাধ্যমে তা স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৬ সালে কসোভো যুগোস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৭৪ সালে যুগোস্লাভ সংবিধান কসোভোর স্বায়ত্ত শাসনকে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রাদেশিক সরকার গঠনের অনুমতি দেয়। ১৯৯০ সালে কসোভোর জাতিগত আলবেনিয়ান নেতারা সার্বিয়া থেকে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৯২ সালে কসোভোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইবরাহীম রুগোভা। শুরু হয় সংঘাত। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে কসোভোর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'কসোভো লিবারেশন আর্মি' বা 'কেএলএ'। এতে সার্বীয়রা পাগলা কুকুরের ন্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচ স্বাধীনতাকামী গেরিলা ও জনগণকে দমন করতে শুরু করে ইতিহাসের বর্বরোচিত পৈশাচিক গণহত্যা। মাত্র ২০ লক্ষ জনগণ অধ্যুষিত ছোট্ট এই দেশটিতে সার্ব বাহিনীর নির্বিচার হামলায় অন্তত দশ সহস্র মুসলমানকে হত্যা করা হয়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। প্রতিবেশী আলবেনিয়ায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায় প্রায় ৬ লক্ষ মুসলমান। অবশেষে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ন্যাটো বাহিনী বিমান হামলা শুরু করে। অতঃপর ৯ জুন মেসিডোনিয়ার কুমালোভায় ন্যাটো ঘাঁটিতে ঐতিহাসিক 'কসোভো শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের পর সার্ব সৈন্যদের পৈশাচিকতা বন্ধ হয়। অবশেষে ঐতিহাসিক 'ডেটন' চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯২ সালের ১ মার্চ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা স্বাধীনতা লাভ করে।[৮১]

ভারতে মুসলিম নির্যাতন :

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা অনুমিত হবে। ১৯০৬ সালে বেনারসে মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯১৪ সালে মুজাফফারাবাদে দাঙ্গা সৃষ্টি করে মুসলমানদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করা হয়। ১৯১৩ সালে অযোধ্যায় গরু কুরবানীকে কেন্দ্র করে বিপর্যয় ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে আরাহ, শাহাবাদ, বিলিয়া ও আযমগড়ের ৪০ মাইল এলাকায় মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালায়। ১৯১৮ সালে কেতারপুরে মুসলমানদের রক্ত ঝরানো হয়। ১৯২২ সালে মুলতানে এক শোক মিছিলের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। ১৯২৩ সালে সাহারানপুরে এবং ১৯২৪ সালে দিল্লী, কলকাতা, এলাহাবাদে হিন্দুরা মুসলিম জনগণের উপর সীমাহীন নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস চালিয়ে হাজার হাজার মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করে। এ সময়ে ঈদুল আযহার দিনে বহু মুসলমানকে

৮১. *মাসিক আত-তাহরীক*, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২।

শহীদ করে। ১৯২৬ সালে কলকাতায় মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হয়। ১৯২৭ ও এর পূর্বে কয়েক বছরে লাহোর, মুম্বাই, মুলতান, ব্রেলী ও নাগপুরে ৩৩টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে, যাতে হাজারো মুসলিমকে হত্যা করা হয়। ১৯৩৫ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তে হিন্দুরা ক্রোধে ফেটে পড়ে। সারা ভারতে তখন হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করতে শুরু করে। বিহার, নোয়াখালী ও পারায় হাজার হাজার মুসলমানকে সীমাহীন নির্মমতার মধ্য দিয়ে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এভাবে আস্তে আস্তে ১৯৪৭ সালের দিকে পৌঁছে যায়। এরপূর্বে ২ বছর যাবৎ হিন্দুরা শিখদের সাথে মিলে মুসলমানদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের গুলির লক্ষ্যবস্তু বানায়। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে অমৃতসরের 'রামবাগে' হিন্দু ও শিখদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে সরদার ওলেভ ভাই প্যাটেল বলেন, 'তোমাদেরকে তরবারি ধরতে হবে। কেননা আমরা কেবল তরবারির মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হাছিল করতে পারি। যদি তোমরা মুসলমানদের সাথে লড়তে চাও, তাহলে আজই তৈরী হও এবং নিজেদের পরিকল্পনা প্রস্তুত কর'।

তৎকালীন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জনৈক অফিসার ঐ সময়কার ঘটনার বিবরণে বলেন, আমি আমার অবস্থানকালীন সময়ে ভয়ংকর অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম এবং বহু লোমহর্ষক ঘটনা শুনেছিলাম। সে সময় একস্থানে ২০ জন মহিলা ও শিশুকে গৃহবন্দী করে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। মহিলাদের পেট চিরে সন্তান বের করে তাদের শিরোচ্ছেদ করা হয়। নারীদের সতীত্ব হরণ করা হয়। এরপর বর্শা-বল্লম দিয়ে তাদের লজ্জাস্থান বিদীর্ণ করা হয়। মহিলাদের নগ্ন-বস্ত্রহীন করে আনন্দ-উল্লাস করে ও তাদের দিয়ে ঐ অবস্থায় শোভাযাত্রা করা হয়। যুবতী মেয়েদের জোর করে ধর্ষণ করার পর তাদের স্বজনদের সামনে তাদেরকে হত্যা করা হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রায় সকল যেলা অমৃতসর, ফিরোজপুর, জলন্ধর, হোশিয়ারপুর, গাংগড়, আম্বালা, রহতক, হিছার, কোড়গাও, পিটিয়ালা, জানীদ, নাভা, কুলিয়া, ভরত, কোহেস্তান ও শামলার সকল এলাকা থেকে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের বের করে দেয়া হয়। ঐ ১৭ হাজার বর্গমাইল এলাকায় কালিমা উচ্চারণকারী কোন লোক অবিশিষ্ট নেই। অধিকাংশকে ব্রাশ ফায়ার করে নিশ্চিহ্ন করা হয়। তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানদের লাশে অলিগলি ভরে যায়। হাজার হাজার শিশুকে বল্লমের তীক্ষ্ণধার প্রান্ত দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। অন্যূন ৪০ হাজার মুসলিম যুবতী মহিলাকে তরবারির জোরে দাসী বানানো হয়, যারা ছাগল-বকরীর ন্যায় বাজারে বিক্রি হতে থাকে।[৮২]

এরূপ সীমাহীন অত্যাচারী-যালেম ও রক্তপিপাসু হিন্দুদের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ভারতের একটি চিহ্নিত দলের নেতার বক্তব্যে সেটা ফুঠে উঠেছে। ২০০২ সালে সংঘটিত ভারতের গুজরাট গণহত্যার অন্যতম হোতা

৮২. *মাসিক শাহাদত* (উর্দু), (ইসলামাবাদ : নভেম্বর ২০০৮), পৃঃ ২২-২৩।

আহমেদাবাদের বাবু বজরঙ্গী প্রথমে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র সদস্য ছিল, পরে 'শিবসেনা' দলে যোগ দেয়। তার একটি বক্তব্য হচ্ছে, 'আমরা মুসলিমদের একটি দোকানও রেহাই দিইনি; সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়েছি... লুট করেছি... বেজন্মাদের আগুনে পোড়াতে আমাদের ভালো লাগে... কারণ ওরা নাকি চিতায় পুড়তে ভয় পায়... আমার একটি মাত্র শেষ ইচ্ছা আছে... আমাকে ফাঁসিতে ঝোলালেও আমি পরোয়া করি না.. তার আগে আমাকে দু'টো দিন সময় দিন। আমি জুহাপুর বস্তির সাত-আট লাখ মুসলিমের যতজনকে পারি এক নাগাড়ে সাবাড় করে দেব... ওদের আরও মারতে হবে... অন্তত আরও ২৫ থেকে ৫০ হাজার'।[৮৩]

ভারতে এখনও এমন ১০টি সংগঠন রয়েছে যারা ইসলামের নাম উচ্চারণকারীদের হত্যাকারী। মুসলিমদের শহীদ করা, তাদের পবিত্র স্থান মসজিদকে ধ্বংস করে মন্দির-গীর্জা নির্মাণ, মুসলমানদের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দেওয়া, সতী-সাধ্বী নারীদের সতীত্ব হরণ করা ও নিষ্পাপ বাচ্চাদের হত্যা করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এসব সংগঠন হচ্ছে- ১. রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ,[৮৪] ২, বজরং দল, ৩, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ৪. শিবসেনা, ৫. ভারতীয় জনতা পরিষদ[৮৫], ৬. হিন্দু মহাসভা, ৭. হিন্দু মানানী, ৮. আরিয়া সমাজ, ৯. সনাতন সমিতি, ১০. ধর্মরক্ষা সমিতি।[৮৬]

ইতালীতে মুসলিম গণহত্যা :

বর্তমান ইতালীর অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপে মুসলমানগণ এক উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেই প্রাথমিক মধ্যযুগে। নর্মানরা সে রাষ্ট্র উৎখাত করে। প্রথম প্রথম নর্মান রাজাগণ বিজিত মুসলমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে তারা মুসলমানদের নির্যাতন করে ও বিতাড়িত করে। সিসিলির পালার্মো শহরের খৃষ্টান নারীরা এ সময়ে হিজাব ব্যবহার করত। চেহারা ঢেকে রাখত এবং হাতে মেহেদী ব্যবহার করত। প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসরমান আরব মুসলমানগণ বিশেষ করে আরব সামরিক প্রকৌশলীরা নর্মান রাজাদের জন্য ভ্রাম্যমাণ অবরোধ টাওয়ার নির্মাণ করে। দুঃখের বিষয়, এগুলো পরবর্তীতে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

নর্মান রাজা রজার ১৮-এর সময়ে সিসিলির যে সব খৃষ্টান মুসলমান হত, তাদের মোটামুটি স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকদের নির্যাতনের শিকার হয়। উইলিয়াম ১ম এর সময়ে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চরমে

---

৮৩. ***দৈনিক প্রথম আলো***, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১০।

৮৪. 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ' (আরএসএস)-এর ভারতব্যাপী ৪৫ হাজার শাখা রয়েছে। এদের অগাধ সম্পদশালী দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং ৭০ লাখ স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে। দ্রঃ ***দৈনিক প্রথম আলো***, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১০।

৮৫. 'ভারতীয় জনতা পরিষদ' (বিজেপি)-এর নেতা এল. কে. আদভানীর প্ররোচনায় ১৯৯২ সালে হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। ১৯৯৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসে এবং ২০০২ সালে গুজরাটে ঘটে মুসলিম গণহত্যা। দ্রঃ ***দৈনিক প্রথম আলো***, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১০।

৮৬. ***মাসিক শাহাদত*** (উর্দু), (ইসলামাবাদ : নভেম্বর ২০০৮), পৃঃ ২২-২৩।

পৌঁছে। গণহত্যা থেকে বাঁচতে অনেক মুসলমান গভীর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্বিতীয় উইলিয়ামের সময়ে ১১৮৫ সালে সিসিলি ভ্রমণকারী ইবনু জুবাইর মুসলমানদের দুর্দশার কথা লিখেছেন। তখন স্থানীয় মুসলমানগণ নির্যাতনের ভয়ে নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিত না। জুম'আর ছালাত আদায় নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে পালার্মোর মসজিদগুলো গীর্জায় পরিণত করা হয়। ধর্মভীরু মুসলমানরা দেশ ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়। যারা থেকে গিয়েছিল তাদেরকে জোর করে খৃষ্টান বানানো হয়। ১১৮৯ সালে পালার্মোতে ব্যাপক মুসলিম গণহত্যা চালানো হয়। ১১৯৯ সালে পোপ ৩য় ইনোসেন্ট সিসিলি ও আপুলার মুসলমানদেরকে খৃষ্টীয় ইতালীর শত্রু পক্ষ হিসাবে ঘোষাণা করে। ফলে মুসলমানরা দেশ ছেড়ে চলে যায়। শুধু বিখ্যাত ভূগোলবিদ শরীফ আল-ইদ্রীসীকে বহু অর্থের বিনিময়ে রজারের দরবারে রেখে দেওয়া হয়। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কিতাবুল রজারি' (রজারের গ্রন্থ) রচনা করেন। জার্মান সম্রাট ৪র্থ হেনরীর সিসিলি বিজয়ের সাথে সাথে সেখানকার ইসলামী ঐক্য সভ্যতা ও সমাজ প্রায় খতম হয়ে যায়। ১১৯৭ সালে বনু আব্বাস গোত্রের (উপাধি মিরাবেগ) ৩০ হাজার মুসলিম সেনার সহায়তায় ২০ বছর ধরে পশ্চিম সিসিলি নিয়ন্ত্রণে রাখলেও জার্মান শাসক দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের হাতে মিরাবেগ বন্দী হন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক সিসিলিকে মুসলমান শূন্য করার ব্যবস্থা করেন। তখন ১৬ হাজার মুসলমানকে লুসেরায় নির্বাসন দেওয়া হয়। ১২৫০ সালে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মৃত্যুবরণ করলে তাকে একটি মসজিদ প্রাঙ্গণে কবর দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে ঐ মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করা হয়। লুসেরায় নির্বাসিত মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর প্রচেষ্টা চালানো হলে মুসলমানরা বিরোধিতা করে। ফলে রাজা চার্লস ২য় আঞ্জুর নির্দেশে ১৩০০ সালের আগস্টে ব্যাপক গণহত্যা চালানো হয়। আর বাকীদের জোর করে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়।[৮৭]

সন্ত্রাসের কারণ

পৃথিবীতে কোন কাজ যেমন এমনি এমনি সংঘটিত হয় না, তেমনি সন্ত্রাসও অযথা সৃষ্টি হয় না। বরং বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবস্থার কারণে সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করে। মনীষীগণ সন্ত্রাস সৃষ্টির কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন। এখানে সন্ত্রাসের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণ উপস্থাপন করা হল।-

১. চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ি : সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ হচ্ছে চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ি। এটা হচ্ছে সীমালঙ্ঘন। আরবীতে একে الغلو বা التطرف বলা হয়। সর্বক্ষেত্রেই এই বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর। যদিও তা ধর্মের লেবাসের অন্তরালে হয়। ধর্মীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে এ বাড়াবাড়ি করা হলেও ইসলাম এথেকে কঠোরভাবে সতর্ক

৮৭. ***সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান***, ১৮ বর্ষ, ২৬তম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, পৃঃ ৯।

করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إياكم والغلو في الدين 'তোমরা ধর্মের মধ্যে চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাক'।[৮৮] তিনি আরো বলেন, هلك المتنطعون 'সীমালঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়েছে'।[৮৯] তিনি আরো বলেন, إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 'সহজপন্থা অবলম্বন ও সরলতার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা আরোপ বা চরমপন্থা অবলম্বনের জন্য নয়'।[৯০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নীতি ছিল দু'টি কাজের মধ্যে অধিকতর সহজটি গ্রহণ করা। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرها ما لم يكن أثما. 'দু'টি কাজের মধ্যে কোন একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উভয়ের মধ্যে সহজটিকে গ্রহণ করতেন, যদি সেটা গোনাহের কাজ না হত'।[৯১]

আল্লাহর দ্বীন বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য এবং কঠোরতা ও নমনীয়তার মধ্যবর্তী এক অনুপম জীবনাদর্শ। তেমনি মুসলিম জাতি অন্যান্য জাতির মধ্যে মধ্যবর্তী উম্মত। মূলতঃ চরমপন্থীরা দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী নয়, বরং তাদের কর্মকাণ্ড রাসূলের সুন্নাত ও আদর্শ পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেন, فمن رغب عن سنتي فليس مني. 'যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৯২]

যারা দ্বীন থেকে বিমুখ থাকবে তাদের মোকাবিলা করা, এমনকি তাদেরকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনতে তাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই বা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন। এর ফলে মনস্তাত্ত্বিক ও সশস্ত্র সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং এটা সন্ত্রাস বিকাশ লাভের একটা অন্যতম কারণ।

মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানগত প্রচার-প্রচারণা কিংবা প্রতিরক্ষা-প্রতিরোধ সহ বিভিন্নভাবে হক্বের দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সন্ত্রাস বিস্তারের অন্যতম কারণ। জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান দ্বীনকে বিজয়ী করে এবং গুলূ (বাড়াবাড়ি) ও জাফা (جفاء) তথা নির্দয়তা-নিষ্ঠুরতা সহ সকল প্রকার চরমপন্থা সীমালংঘন ও অতিরঞ্জনের পংকিলতা থেকে দ্বীনকে রক্ষা করে। আর غلو (বাড়াবাড়ি), جفاء (নির্দয়তা) ও تطرف (চরমপন্থা) সন্ত্রাস বিকাশ লাভের কারণ। বরং এসব সন্ত্রাস

---

৮৮. ***মুসনাদে আহমাদ***, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫; ***ইবনু খুযায়মাহ***, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬৭; ***নাসাঈ***, 'হজ্জ' অধ্যায়, ***ইবনু মাজাহ,*** 'হজ্জ' অধ্যায়, ***সিলসিলা ছহীহা***, হাদীছ নং ১২৮৩; ***মুস্তাদরাকে হাকিম***, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬।

৮৯. ***মুসলিম***, 'ইলম' অধ্যায়; ***আবু দাউদ,*** হা/৪৬০৮।

৯০. ***বুখারী***, 'মসজিদের প্রস্রাব করার পর তাতে পানি ঢেলে দেওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/৮, ৩৬; ***মুসলিম***, 'পবিত্রতা অধ্যায়; ***তিরমিযী*** হা/১৪৭; ***আবু দাউদ*** হা/৩৮০।

৯১. ***বুখারী***, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়; 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, ***ফাৎহুল বারী***, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৬৬; ***মুসলিম***, 'সদাচরণ' অনুচ্ছেদ।

৯২. ***মিশকাত***, হাদীছ নং ১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।

বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরী করে এবং মানব মনে ভ্রান্ত ও অর্থহীন চিন্তার অনুপ্রবেশের সহজ রাস্তা তৈরী করে। এসব কাজ হক্ব ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মাঝে Circle (বৃত্ত) বা পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন সৃষ্টি করে। এতে হক্বের দিকটা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন বাতিল শক্তিশালী হয় ও বিকাশ লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 'আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্ভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) গোমরাহী ছাড়া কি রয়েছে, সুতরাং কোথায় ঘুরছ' *(ইউনুস ৩২)?*[৯৩]

২. ক্ষতিকর ও ভ্রান্তচিন্তা : যারা ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হয়, তারা মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে একাজ করে না। এই ভ্রান্তকর্ম কখনও সংঘটিত হয় অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তির দ্বারা। কেননা সে তার অজ্ঞতার কারণেই বাস্তবতা ও প্রকৃত অবস্থার বিপরীত চিন্তা করে। কিংবা এ ভ্রান্তচিন্তা সংঘটিত হয় প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তির দ্বারা। কেননা প্রবৃত্তি তার উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে সে হক্ব ভুলে যায় কিংবা ভুলে যাওয়ার ভান করে ও হক্বকে অবহেলা করে। এ কারণে তার চিন্তা-চেতনা তাকে অপরাধ ও পাপ কর্মের দিকে ধাবিত করে।

কখনো কখনো ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা হয় পথভ্রষ্টতার পথ ধরে, যখন কোন ব্যক্তির নিকটে গোমরাহী তথা ভ্রষ্টতা এসে পৌঁছে এবং সে ঐগুলির উপর ভিত্তি করে আমল করতে শুরু করে। এ কারণে সে ঐ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয় এবং সুপথ ও সঠিক রাস্তা বিচ্যুতির ফলে সে পরবর্তীতে নিন্দিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ এমন কতিপয় সম্প্রদায়ের সংবাদ দিয়েছেন যারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং তথায় ভোগ করবে কঠিন শাস্তি। অথচ তারা মনে করে যে তারা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না' *(কাহাফ ১০৩-১০৫)*।

৩. পারিবারিক : মানব সমাজের প্রথম ভিত্তি পরিবার। মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শুধু পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না; বরং পরিবারের কিছু নিয়ম-কানূনও সে শিখে। মানুষের চরিত্র-মাধুর্য ও জীবন যাত্রার প্রথম ভিত্তি তৈরী হয় পরিবার থেকেই। পরিবারকে তাই প্রথম শিক্ষাগার বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা এখান থেকে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে সেটাই সে পরবর্তীকালে কাজে লাগায়। সুতরাং বলা

---

৯৩. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলে শায়খ, আল-ইরহাব আসবাবুহু ওয়া ওয়াসায়িলুল ইলাজ, ***মাজাল্লাতুল বহূছিল ইসলামিয়্যাহ*** (সঊদী আরব: রজব-শাওয়াল ১৪২৪ হিজরী/সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৩ খৃষ্টাব্দ), পৃঃ ১২০।

যায়, ব্যক্তি জীবনে পরিবারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পারিবারিক জীবনে বাল্য এবং কৈশোরে ব্যক্তি যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা তার আচরণের উপর এমন প্রভাব ফেলে যে, তার আচরণ খুব কম ক্ষেত্রেই পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে ভিন্নধর্মী হয়। তাই ব্যক্তির সন্ত্রাস প্রবণতার পিছনে পরিবারের ভূমিকাকে ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পারিবারিক সুশিক্ষা নেই বললেই চলে। কারণ অনেক পরিবারে পিতা-মাতা উভয়েই কর্মজীবি। তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যাওয়ার ফলে সন্তানের দেখাশুনা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব পড়ে গৃহপরিচারিকা বা এ জাতীয় কারো উপরে। তার নিকট থেকে শিশু বা কিশোর যথাযথ শিক্ষা পায় না, পায় না কাঙ্খিত আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা। এতে সে একদিকে যেমন স্নেহবঞ্চিত হয়, অন্যদিকে হয় পারিবারিক সুশিক্ষা বঞ্চিত। পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত এসব ছেলেরা হয় নিষ্ঠুর-নির্দয় প্রকৃতির। দিনের অধিকাংশ সময়ে পিতামাতার তত্ত্বাবধান না থাকায় এসব ছেলেরা অন্যদের সাথে মিশে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হয়। পিতামাতা কর্তৃক সময়মত শাসন ও আদব শিক্ষা না পেয়ে এসব ছেলেরা একসময় পিতামাতার অবাধ্য হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সন্ত্রাসী চরিত্রও সৃষ্টি হয় ক্রমান্বয়ে। আর এদের দ্বারাই ঘটে বিভিন্ন সহিংস ঘটনা।

৪. সামাজিক : সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সামাজিক প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামাজিক রীতিনীতির জটিলতা, সামাজিক অস্থিরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন ও প্রবঞ্চনা মানুষকে সন্ত্রাসী হিসাবে গড়ে তোলে। বিশেষ করে মানুষ যখন সামাজিকভাবে নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কিংবা প্রভাবশালী মহলের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয় তখন মানুষ স্বীয় অধিকার আদায়ে এবং অত্যাচারের প্রতিবিধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়।

তাছাড়া মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে অনুকরণপ্রিয়তা। সমাজে মানুষ বসবাস করতে গিয়ে অনেক সময় সে এমনসব ব্যক্তিদের আচার-আচরণ, রুচি এবং ফ্যাশনের অনুকরণ করে, যা ব্যক্তির মনকে আকৃষ্ট করে। এভাবে সমাজবদ্ধ মানুষ একে অপরের আচরণকে নকল করে এবং স্বাভাবিকভাবেই এসব অনুকরণ ব্যক্তির আচরণ রূপে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার মানুষের চাহিদা সীমাহীন, কিন্তু তার যোগানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ একে অপরের যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে নিজের অবস্থান তুলনা করে অনেকে উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে। এ ধরনের অদম্য উচ্চাভিলাষ মানুষকে তার লক্ষ্য অর্জনে যে কোন পন্থা অনুসরণে বাধ্য করে। এজন্য সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, অপরাধ (সন্ত্রাস) হল সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা হতে সৃষ্ট। Gabriel Tarde (১৮৪৩-১৯০৪) বলেন, একজন অপরাধী অন্য কাউকে

অনুকরণ করে। যখনই সে খুন, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি করে, তখন ধরে নিতে হবে সে অন্য কাউকে অনুকরণ করছে।[৯৪]

৫. অর্থনৈতিক : সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। তাছাড়া সম্পদের অসম বণ্টন, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য প্রভৃতির ফলে সমাজে বিচিত্র ধরনের অপরাধ বা অপকর্ম সংঘটিত হয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, সন্ত্রাস ইত্যাদি অর্থনৈতিক কারণেই সৃষ্টি হয়। এসব অপরাধ কেবল অভাবী সাধারণ মানুষ করে না; বরং অনেক শিল্পপতিরাও রাহাজানি করে থাকে। তাদের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, উৎপাদন ও বণ্টন বৈষম্যের ফলে সমাজের এক শ্রেণীর লোক ক্রমান্বয়ে সর্বহারা হয়ে পড়ে এবং পুঁজিপতিরা ক্রমশঃ ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। শ্রমিকরা ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সংঘটিত হয় নানা রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

এর সাথে আরেকটি বিষয় সংযুক্ত তা হচ্ছে বেকারত্ব। এর কারণে মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়। আর দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষ অনেক ক্ষেত্রে নৈতিকতা ভুলে গিয়ে যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। এসব লোকদেরকে এক শ্রেণীর অর্থ-বিত্তশালী লোকেরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে অর্থ দিয়ে সন্ত্রাসের পথে ধাবিত করে।

৬. রাজনৈতিক : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে নাশকতামূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। কোন কোন দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে কিংবা রাজনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেশীশক্তির বলে আদায়ের লক্ষ্যে বিপুল অর্থের বিনিময়ে সন্ত্রাসী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলে এবং নিজের বিভিন্ন হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এসব বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে লালন করে। এরাই এক সময় জাতির গলগ্রহ হয়ে দেশ ও জাতির জন্য অমঙ্গল ও অকল্যাণ বয়ে আনে।

৭. সাংস্কৃতিক : টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি ও সিনেমায় প্রদর্শিত মারদাঙ্গা ছবি ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন চিত্র দেখে দেশের তরুণ প্রজন্ম ঐসবের অনুশীলন করে। ছবি দেখে দেখে ক্রমে তারা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও রপ্ত করে ফেলে। এভাবে এক পর্যায়ে তারা সন্ত্রাসী হিসাবে গড়ে ওঠে। এছাড়া স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠানও তারা ঘরে বসে দেখার সুযোগ পাচ্ছে। এসব অপসংস্কৃতির ফলে সৃষ্ট সামঞ্জস্যহীনতা, সিনেমা, ভিসিআর ও টেলিভিশনে প্রদর্শিত অসামাজিক ছবি, পত্র-পত্রিকা, বিজ্ঞাপন ম্যাগাজিন প্রভৃতি অশ্লীল যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে এবং এসবের ফলে অনেক সময় তাদের মাঝে সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী মনমানসিকতা। সুতরাং সুস্থ

৯৪. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খৃঃ/১৪২৫হিঃ), পৃঃ ৩৭৫-৭৬।

চিত্ত বিনোদনের অভাব ও অসামাজিক চিত্তবিনোদনকে সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

৮. বিচার ব্যবস্থার জটিলতা : বিচার ব্যবস্থায় ত্রুটি, জটিল প্রক্রিয়া ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক সময় নিরপরাধ লোকও শাস্তি পায় এবং প্রকৃত অপরাধী বড় বড় আইনজ্ঞ নিযুক্ত করে আইনকে ফাঁকি দিয়ে শাস্তি থেকে রেহাইও পেয়ে যায়। ফলে নির্দোষ ব্যক্তি আইন-আদালত ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে ক্রমে দাগী সন্ত্রাসী হয়ে পড়ে।

৯. প্রশাসনিক দুর্বলতা : পুলিশের দুর্নীতি, দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব, সীমিত ক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রভৃতি কারণে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ফলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ যথাযথভাবে কাজ করে দেশের অভ্যন্তরে কোথায় কি ঘটছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করলে কিংবা তারা নিষ্ক্রিয় থাকলে অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবহিত হওয়ার পরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অপরাধ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির শিকড় বিস্তার করে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তখন তাদের দমন করা ও নির্মূল করা কষ্টসাধ্য ও দুরূহ হয়ে পড়ে। আবার প্রশাসনের দুর্বলতা ও অবহেলার সুযোগেই সন্ত্রাসীরা তাদের আসন গেড়ে বসে। এজন্য প্রশাসনের সকল স্তরে সকল প্রকার দুর্বলতা দূর করে সর্বদা সবাইকে সচেতন ও সজাগ রাখার ব্যবস্থা করা যরূরী।

১০. পারিপার্শ্বিক অবস্থা : স্বদেশপ্রেম ও ধর্মীয় মূল্যবোধে যারা উজ্জীবিত নয় তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন ও মদদে অনেক সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। যারা ইসলামকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার হীন মানসে ইসলাম বিদ্বেষী বিদেশী প্রভুদের খুঁদ-কুড়ো খেয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে সারা বিশ্বে কলঙ্কিত করতে সচেষ্ট, তাদের সাহায্য-সহযোগিতায়ও সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কার্যকলাপ পরিচালিত হতে পারে। তারা অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন একশ্রেণীর মুসলিম নাগরিকদের মাধ্যমে ইসলামের নামে এবং জিহাদের অপব্যাখ্যা করে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে একে জিহাদ বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতি সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এভাবে মুসলিম জাতিকে বিশ্বময় কলঙ্কিত করে ইসলাম বৈরীশক্তি নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্য তথা বোমা ও গ্রেনেড তৈরীর সরঞ্জামাদির সহজলভ্যতা এবং এ সবের নির্বিঘ্ন লেনদেনের সুযোগ-সুবিধাও মানুষকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত করে। সাথে সাথে সন্ত্রাসীরাও হয়ে ওঠে বেপরোয়া।

১১. বুদ্ধিবৃত্তিক : জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে শারঈ বিষয়ে অজ্ঞতা ও শারঈ জ্ঞানের স্বল্পতা। ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকার কারণে কুরআন ও হাদীছের অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে কুরআন-হাদীছের ভুল ও অপব্যাখ্যা করে জঙ্গী তৎপরতা চালায় এক শ্রেণীর লোক। তেমনি জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে হক্ব ও বাতিল যাচাই-বাছাই না করা, বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেম-ওলামার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করা, তাক্বওয়ার অভাব, দ্বীনের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে না থাকা, সঠিক ইলম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি কারণেও কোন কোন লোক শরী'আতের নির্দেশকে যথার্থভাবে না বোঝার কারণে কিংবা অতি আবেগে তাড়িত হয়ে জঙ্গী তৎপরতায় লিপ্ত হয়।

শারঈ জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা ও অপরিপক্কতার কারণে চরমপন্থী ব্যক্তি বা দল দেশের মুসলিম শাসকবর্গকে কাফির গণ্য করে তাদের আনুগত্য পরিহার করে ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফৎওয়া দেয়। কবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে অমুসলিম হিসাবে ঘোষণা করে। ইসলামী জিহাদের মর্মার্থ, প্রেক্ষাপট, ধরন ও উদ্দেশ্য অনুধাবন না করে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কর্মকাণ্ড চালায়।

১২. মনস্তাত্ত্বিক : সন্ত্রাস সৃষ্টির পিছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার সুষ্ঠু ও যথার্থ বিকাশ না হলে ব্যক্তির মাঝে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হয়। মানসিক দুর্বলতা, মানসিক বিকার ও বিপর্যস্ততা মানুষকে বিভিন্ন অপরাধমূলক ও সন্ত্রাসী কাজে প্রবৃত্ত করে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনে যখন নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়, তখন মানুষ সন্ত্রাস করতে বাধ্য হয়। মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়, দুর্বল চিত্ত, মনোদৈহিক ব্যাধি প্রভৃতি কারণেও মানুষ সন্ত্রাস করে। সন্ত্রাসের জন্য যেসব মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি দায়ী তন্মধ্যে প্রত্যাখ্যাত শিশু, অতিরিক্ত আদর-স্নেহ, অতিশাসন, পিতা-মাতার দাম্পত্য কলহ সহ অস্বাভাবিক আচরণ, ব্যর্থতা, হতাশা, পারিবারিক পরিবেশ, পিতামাতার উচ্চাশা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিগম্যান্ড ফ্রয়েড বলেন, সামাজিক রীতিনীতিতে সাধারণত মানুষের আবেগ পরিপূরণে বিঘ্ন ঘটে, ফলে মানুষ অপরাধী হয়। তিনি আরো বলেন, মানুষের দু'ধরনের মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) রয়েছে। যথা-জীবনপ্রবৃত্তি (Life Instinct) এবং মরণপ্রবৃত্তি (Death Instinct)। জীবনপ্রবৃত্তি মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৈবিক চাহিদা, ভালবাসা ইত্যাদির মূলে সক্রিয়। জীবনপ্রবৃত্তি মানুষকে বেঁচে থাকার, তার বংশ বৃদ্ধির এবং সর্বোপরি তার অস্তিত্ব বজায় রাখার পিছনে এক দুর্দমনীয় অনুপ্রেরণা বা চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। পক্ষান্তরে মরণপ্রবৃত্তি মানুষের ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং সর্বোপরি ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। মরণপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদির আশ্রয় নেয় এবং যে কোন ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হয়।[৯৫]

৯৫. C.S. Hall, and G. Lindzey, ***Theories of Personality*** (New York : Jehon Willeyssons Inc. 1966), P. 40.

১৩. আন্তর্জাতিক : কোন দেশকে কোণঠাসা করার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হচ্ছে সে দেশের উপর সন্ত্রাসী অভিযোগের কালিমা লেপন করা। এক্ষেত্রে সফল হতে পারলে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একত্রিত হয়ে সে দেশকে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত খেলতে পারে এবং সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সহ বিভিন্ন সম্পদ সহজেই হস্তগত করতে পারে। তাই এই সূক্ষ্ম অস্ত্রকে ব্যবহার করে পার্শ্ববর্তী দেশকে বা পৃথিবীর যে কোন দেশে নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্র সেদেশের নাগরিকদেরকে অর্থ, অস্ত্র সরবরাহ করে এবং বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে। আর যখন সে দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় তখন তা দমনের দোহাই দিয়ে সে দেশে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। এক পর্যায়ে দেশটি করতলগত করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করে এবং লুটে নেয় সে দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সহ বিভিন্ন সম্পদ।

১৪. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার : ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্য চক্র বিশ্বব্যাপী বিষ ছড়াচ্ছে। যা সন্ত্রাসকে উসকে দেয়। ২০০৬ সালের এক রিপোর্টে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক হাজার টিভি চ্যানেল ও দুই শতাধিক রেডিও একই সাথে ইসলামের বিরোধিতা করছে। এরা অব্যাহতভাবে কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করছে। ৯/১১'র পর দ্য সিজ, শেখ, দ্য জুয়েল অব দ্য লাইন ইত্যাদি নামে ঐ সময়ে হলিউডে অন্তত ১২টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়, যেগুলোতে মুসলমানদের চিত্রিত করা হয়েছে নিকৃষ্ট মানুষ ও সন্ত্রাসী হিসাবে। ঐ রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত প্রায় ১ হাজার ৭শ' দৈনিক ও ৮শ' সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশই সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিষ ছড়াচ্ছে। মূলতঃ জর্জ ডব্লিউ বুশের দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।[৯৬] কিছু দিন পূর্বে ডেনিস পত্র-পত্রিকায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে বিকৃত কার্টুন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের কোন কোন পত্রিকায়ও রাসূলের ছাহাবীদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। মুসলমানদের উসকে দেয়াই ছিল এই অপচেষ্টার লক্ষ্য। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও মুসলমানদের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা।

সর্বোপরি সন্ত্রাসী তৈরীর ব্যাপারে সামাজিক সংগঠন, পুলিশের সন্দেহজনক তদন্ত, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে গ্রেফতার এবং গ্রামের বা মহল্লাবাসীদের ব্যক্তিগত শত্রুতার শিকারে পরিণত হয়েও অনেকে বাকী জীবন সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়।[৯৭]

সন্ত্রাস দমনে করণীয়

৯৬. *দৈনিক ইনকিলাব*, ৯ অক্টোবর ২০০৮, পৃঃ ৭।
৯৭. *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।

সন্ত্রাস বর্তমানে বিশ্বের এক প্রধানতম সমস্যা। একে দমন, প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে প্রয়োজন যুগোপযুগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। কেবল আইন প্রণয়ন করে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়; বরং প্রয়োজন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। আবার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শুধু সন্ত্রাসীকে শাস্তি দিয়েই সন্ত্রাস নির্মূল হয়েছে এ ধারণা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আদৌ উচিত নয়। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সন্ত্রাসের কারণ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি দূরীভূত করে সন্ত্রাস সৃষ্টির সকল প্রকার পথ রুদ্ধ করার মাধ্যমে সন্ত্রাস দমনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সন্ত্রাস নির্মূলে আমরা এখানে কতিপয় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে চাই। সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ-

১. ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুন্দর কর্মের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন : ইসলামী শিক্ষার যথাযথ প্রকাশ ও উপস্থাপনা এবং রাজনীতি, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় ও সংযুক্তকরণ, মানুষের মধ্যে তার বিস্তার ও প্রসার এবং তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক এজন্য যে, এটা ইনছাফ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা ও সকল প্রকার অনিষ্ট, অকল্যাণ হ্রাস ও দমনের একমাত্র মাধ্যম। দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ, সচেতন মুসলিম নাগরিকদেরকে বিশেষভাবে এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে ও ভূমিকা পালন করতে হবে। আর মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যেই এ আন্দোলন ও জাগরণের দায়িত্ব পালন করতে হবে।[৯৮]

দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে এ ব্যবস্থার অধীনে দেশের প্রতিটি মুসলিম নাগরিক ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ ও চর্চা করবে। সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করবে ও স্ব স্ব ধর্মের চর্চা করবে।

২. সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শারঈ ইলমকে সুদৃঢ় করা : আমরা যখন স্বীকার করব যে মধ্যপন্থা হচ্ছে সকল প্রকার চরমপন্থা সম্পূর্ণরূপে দমনের মাধ্যম, তখন আমাদের সে সম্পর্কে জানতে হবে, সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জন করতে হবে। আমাদেরকে অজ্ঞতার তিমির থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞানের আলো ঝলমল রাজপথে বিচরণ করতে হবে। আমাদেরকে মধ্যপন্থার পদ্ধতি অনুসন্ধান করে বের করতে হবে এবং তার প্রকৃত অবস্থা জানতে হবে। প্রকৃত মধ্যপন্থা হচ্ছে যার শক্তি ও ক্ষমতা আছে এবং যা অব্যাহত ও গতিশীল। আর এ মধ্যপন্থা কিতাব ও সুন্নাতের সাথে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত এবং যা হবে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। কেননা তাঁরা ছিলেন কুরআন নাযিলের সমসাময়িক। ফলে তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণীর মর্ম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত ছিলেন।[৯৯] মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব

---

৯৮. *মাজাল্লাতুল বহুছিল ইসলামিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।
৯৯. *ঐ*, পৃঃ ১২১।

পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও' *(আন'আম ১৫৩)*। এক্ষণে এখানে দু'টি পথ খোলা আছে। একটি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত ছিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল-সঠিক পথ এবং অপরটি গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির পথ। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐদিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান' *(নিসা ১১৫)*।

মধ্যপন্থার হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিকে সকল মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আবশ্যক হল শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো। এছাড়া শক্তিশালী ও জোরালো প্রচার কার্যক্রম ও তৎপরতার মাধ্যমে প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করে মধ্যপন্থার সুফল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা, যাতে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম সমাজ, দাঈ ও বক্তাগণকে এ মহান কাজ কেবল ছওয়াব মনে করে করতে হবে। সমাজের লোকদের নিকট গিয়ে এ বিষয়টি তাদেরকে বুঝাতে হবে। আর সুচারুরূপে এ কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ ফিরে আসবে।[১০০]

৩. সন্ত্রাসের স্বরূপ সবার সামনে প্রকাশ করা : প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সবার কাছে সন্ত্রাসের স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে হবে। যাতে এই মুছীবত সমাজ থেকে সর্বোতভাবে দূরীভূত হয়। সাথে সাথে সন্ত্রাসের অর্থবোধক, সমার্থক ও নির্দেশনামূলক শব্দ ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। ইসলামী সমাজকে যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত রাখতে আমাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বলা বাহুল্য যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের ছোবলের মুখে দণ্ডায়মান। সুতরাং তাদের হিংস্র ছোবল থেকে নিজেদেরকে ও সমাজকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে এক্ষেত্রে অবহেলা করলে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট আমরা হব নিন্দিত ও ধিক্কৃত। তাছাড়া এ দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওয়াদা করেছিলাম। সুতরাং সে প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পিছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ ক্রয়-বিক্রয়'! *(আলে ইমরান ১৮৭)*।[১০১]

৪. শারঈ পরিভাষা জনসম্মুখে স্পষ্টরূপে উপস্থাপন করা : শারঈ পরিভাষা সমূহ সংরক্ষণ ও জনসম্মুখে সুস্পষ্টরূপে পেশ করা, যাতে অত্যাচারীরা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা ঐসব শব্দের অপব্যাখ্যা করে ফায়দা লোটার কোনরূপ সুযোগ না পায়।

১০০. *ঐ*, পৃঃ ১২১।
১০১. *ঐ*, পৃঃ ১২১।

ঐসব পরিভাষা হচ্ছে- জিহাদ, দারুল হারব, দারুল ইসলাম, উলীল আমর, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি ইত্যাদি। এছাড়া আরো অন্যান্য বিষয় যা দ্বীন ইসলামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং উপরোক্ত পরিভাষাগুলির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ আমাদের জানা আবশ্যক।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সন্ত্রাস বিস্তার ও প্রসারের অন্যতম কারণ হচ্ছে পাপাচার ও অন্যায়-অপকর্মের ব্যাপকতা। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৪১)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন' *(শূরা ৩০)*।

আর পাপ কর্ম থেকে ফিরে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে তওবা করা। এজন্য সঊদী আরবের বর্তমান গ্রান্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আলে শায়খ বলেন, ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 'পাপাচার বা গোনাহের কারণেই বিপদ-আপদ আপতিত হয়। আর কেবল তওবার মাধ্যমেই তা দূরীভূত হয়'।[১০২]

৫. ইসলাম প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাই সমাজে ও দেশে সন্ত্রাস সংঘটিত হওয়ার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাকে পূর্বেই বন্ধ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে।

৬. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত পূর্বযুগের অবাধ্য ও সন্ত্রাসী জাতির শোচনীয় পরিণতি এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সন্ত্রাসের পরিণাম সম্পর্কে ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিভিত্তিক প্রতিবেদন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রেস মিডিয়া, বই-পুস্তক বা অন্যান্য মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

৭. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিধানের যথাযথ চর্চা করা। বাল্যকাল থেকেই সন্তানদের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা। সমাজ, পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি সৃষ্টিকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। যাতে তাদের মনে সৎকর্ম করার এবং অসৎকর্ম বর্জনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে তাদের অন্তরে যাতে সকল প্রকার অপরাধ, অপকর্ম ও সন্ত্রাসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় তার যথাযথ শিক্ষাও প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের মৌলিক ফরয সমূহ যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ পালনের তাকীদের সাথে সাথে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আদর্শ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। রাষ্ট্রের সকল পদ ও দায়িত্বে তাক্বওয়াসম্পন্ন যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অধিষ্ঠিত করতে হবে।

---

১০২. *ঐ*, পৃঃ ১২১।

৮. ইসলামী শরী'আত ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সকল প্রকার অপরাধীদের দ্রুত ও সঠিক বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিনা বিচারে যাতে কেউ বছরের পর বছর কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ধুকে ধুকে না মরে তার কার্যকর ব্যবস্থা করতে হবে। আবার আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে সন্ত্রাসীরা যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে শাসন বিভাগকে সকল প্রকার কু-প্রভাব ও পেশীশক্তি থেকে মুক্ত করা এবং 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির উপর পুলিশ বাহিনীর অটুট থাকার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে ইনছাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল বা কর্মকর্তার নিকটে নয়; বরং আল্লাহ্র কাছে মানুষের সকল কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে-এই অনুভূতি প্রশাসনের সকল স্তরে জাগ্রত করে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

৯. সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। কেননা প্রতিটি ধর্মই সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে, সন্ত্রাসীর শাস্তি বিধানকে সবাই ধর্মীয় বিধান মনে করে। এ দেশে বসবাসরত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিধান শিক্ষা দান এবং সে বিধান মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। সন্ত্রাস মহাঅপরাধ এবং এর পরিণতি ভয়াবহ এই অনুভূতি সকলের হৃদয়ে জাগ্রত করতে হবে।

১০. সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে গিয়ে কেউ নিহত হলে তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন এবং জান্নাত লাভ করবেন- এ দৃঢ় বিশ্বাস সবার অন্তরে জাগ্রত করতে হবে।

১১. সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জনগণের হৃদয়ে সন্ত্রাসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বশীলতা জাগ্রত করা তথা সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা করা। এজন্য অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ মারদাঙ্গা ছবি প্রদর্শন ও পর্ণ পত্রিকা, বই-পুস্তক ইত্যাদি বন্ধের মাধ্যমে জাতিকে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে হবে।

১২. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীচক্র নস্যাৎকরণ ও তাদের সাথে দেশের জনগণ যাতে সংশ্লিষ্ট হতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, গডফাদারদের অপশক্তি নির্মূলকরণ, সাধারণ সন্ত্রাসীদেরকে সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনের দিকে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান এবং তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী তথা অনাথ-ইয়াতীম, বিধবা-তালাকপ্রাপ্তা, শহরের নিঃস্ব টোকাই ও অসহায় জনগোষ্ঠী, দুর্যোগ কবলিত ও দুঃস্থ মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন, নারীকল্যাণ, যুবকল্যাণ ও শিশুকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ, ভিক্ষুক ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের অধিকাংশই অল্প শিক্ষিত। কিছু মতলববাজ স্বার্থান্বেষী বিভ্রান্ত নামধারী আলেম ঐসব স্বল্প শিক্ষিত লোকদের সামনে জিহাদকে বিশেষ উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে বিপথগামী করেছে। এসব নামধারী আলেমদের মুখে জিহাদের ফযীলত ও জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের কথা শুনে শাহাদত বরণের মাধ্যমে বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের আশায় তারা উজ্জীবিত হয়েছে, ইসলাম কায়েমের জন্য জীবন দিতেও অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাদের মাথায়-মগজে, চিন্তায়-মননে, আক্বীদা-বিশ্বাসের পাথরে খোদাই করে দেয়া হয়েছে, এভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জীবন দিলে পরকালে বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ করা যাবে। সুতরাং জেল-যুলুম, ফাঁসি, ক্রসফায়ার ও মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাদের এ বিশ্বাসের পাথর ক্ষয় করা যাবে না, টলানো যাবে না তাদের অবস্থান থেকে; বরং তারা এসব হাসিমুখে বরণ করবে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধ করতে চাইলে তাদের ঐ বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানতে হবে, তাদের বিশ্বাসের ভিত ভেঙ্গে দিয়ে তাদের বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সত্যের আলোয় বের করতে আনতে হবে। এজন্য দেশের হক্বপন্থী আলেমগণের দ্বারা তাদের বুঝানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রচার মাধ্যমে ঐসব ওলামায়ে কেরামের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। একে স্থায়ীভাবে রূপদানের জন্য আলিয়া ও কওমী মাদরাসা এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় জিহাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা তুলে ধরতে হবে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদেরকে কেউ ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

১৫. সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িতরা এদেশেরই নাগরিক। জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে এদেশের সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসীদেরকে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের নকশাল বাহিনীর দৌরাত্ম ও অপতৎপরতা দমনে সেখানকার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত সংস্থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশে বিদ্যমান ন্যূনাধিক তিন লাখ মসজিদে প্রতি মাসে ৪ থেকে ৫ বার জুম'আর ছালাত হয়। এসব মসজিদের ইমামদেরকে কুরআন-হাদীছের আলোকে সন্ত্রাসবিরোধী খুৎবা দিয়ে জনগণকে সজাগ ও সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। তাহলে সন্ত্রাসীদের ভিত্তিভূমি বিলুপ্ত হবে। সাথে সাথে দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

১৬. বোমা তৈরীর যেসব সরঞ্জামাদি বাহির থেকে আসে, সেগুলো দেশে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমান্তে নজরদারি জোরদার করতে হবে। বোমা তৈরীর সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় ও সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালনায় অর্থ যোগানদাতাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদেরকে আইনের আওতায় এনে যথাযথ বিচার করতে হবে। সাথে সাথে নেপথ্য পরামর্শক, পরিচালক গডফাদারদেরকেও পর্দার আড়াল থেকে বের করে

এনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা ক্ষত সারাতে আক্রান্ত স্থানে ওষুধ প্রয়োগ না করলে ক্ষত শুকাবে না।

১৭. আত্মঘাতী বোমা হামলাসহ সব ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে আমাদের দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

১৮. দলমত-নির্বিশেষে সকলকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যমত্য হয়ে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ সন্ত্রাসীরা গ্রহণ করতে না পারে। বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সন্ত্রাসের মত দেশ ও জাতি বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সবাইকে সকল প্রকার মতদ্বৈততা ও স্বার্থদ্বন্দ্ব পরিহার করে একই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

সন্ত্রাস মোকাবিলায় দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী পদক্ষেপ হিসাবে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা আবশ্যক :

(ক) দেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। যাতে দেশের কোটি কোটি হতাশাগ্রস্ত বেকার তরুণ-যুবক কর্মের সুযোগ পেয়ে হতাশ জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় এবং দেশ সেবার মত মহান কাজে আত্মনিয়োগ করে অবদান রাখতে পারে।

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে অন্ততঃ কলেজ স্তর পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, যাতে এক গোষ্ঠীর প্রতি অন্যের ঘৃণা-বিদ্বেষ, অবহেলা-অবজ্ঞার পরিবেশ ও সুযোগ না থাকে। সে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় Moral science বা নৈতিক জ্ঞানেরও ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেন কর্মক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীরা তাদের নৈতিক শিক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকে।

গ. সরকারীভাবে প্রশাসনের সকল পর্যায় থেকে ঘুষ, দুর্নীতি ও যা মানুষকে শাসন ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে তা অবশ্যই নির্মূল করতে হবে। ধনী-দরিদ্রের ভেদ-বৈষম্য কমাতেও পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশকে Indenting পর্যায় থেকে Manufacturing পর্যায়ে উন্নীত করতে পারলেই কেবল দেশের সব যুবশক্তিকে জাতির গঠনমূলক কাজে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায়।[১০৩]

সর্বোপরি প্রশাসনের তৃণমূল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যেখানে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। জাতীয় সংসদে নির্দিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন পেশাজীবিদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে হবে। স্থানীয় সরকার কাঠামো কার্যকরী করার লক্ষ্যে একে পুনর্বিন্যাস করে সৎ, যোগ্য ও ধর্মভীরু লোকদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা অতীব যরূরী। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১০৩. *ইনকিলাব*, ২১ জুলাই'০৭, পৃঃ ২০।

গড়ে তোলার লক্ষ্যে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধি বিকাশের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

ইসলাম শান্তি-মৈত্রী, সম্প্রীতি-সদ্ভাব, উদারতা-পরমতসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ্য, সহাবস্থান-সহনশীলতার ধর্ম। ইসলাম শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধের উপর নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করা। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সুন্দর গুণবাচক নাম সমূহের অন্যতম হচ্ছে 'সালাম' তথা শান্তি। তাই আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলামে কোন প্রকার অশান্তি-অস্থিরতা, অসহনশীলতা-অসহিষ্ণুতা, অনিয়ম-অরাজকতা, অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদি থাকতে পারে না। কিন্তু অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামবিরোধীরা আজ শান্তিময় ও সুশৃংখল ইসলাম এবং অশান্ত ও বিশৃংখল সন্ত্রাসকে একাকার করে ফেলেছে। ইসলামের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ও বীতশ্রদ্ধ ইসলামবিদ্বেষী মহল দাবী করে যে, ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে। এর চেয়ে বড় অসত্য ও অপবাদ আর কি হতে পারে?

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, ইসলাম কখনো হত্যা কিংবা সন্ত্রাসকে উসকে দেয় না বা উৎসাহিতও করে না; বরং ইসলামে এসব নিষিদ্ধ-হারাম। কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে, 'নরহত্যা বা পৃথিবীতে ফাসাদ করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষেরই জীবন রক্ষা করল' *(মায়েদাহ ৩২)*। শুধু তাই নয়, ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা যেন জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং আইনের শাসন ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়' *(আনফাল ৩৯)*।

উলেখ্য যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এমন কোন শব্দ নেই যা সন্ত্রাস ও আগ্রাসনকে সমর্থন বা উৎসাহিত করে। বরং ইসলাম সর্বদাই সন্ত্রাস, আগ্রাসন ও জঙ্গীবাদকে নিন্দা করে, ধিক্কার জানায়। সন্ত্রাসীদের জন্য কঠোর শাস্তির জোরালো ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ফিতনা (দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশৃংখলা) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর' *(বাক্বারাহ ১৯১, ২১৭)*।

তিনি আরো বলেন, 'যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত ও নিকৃষ্ট আবাসস্থল' *(রা'দ ২৫)*। সন্ত্রাসীদের নিরুৎসাহিত ও নিবৃত্ত করতে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যায় এবং সমাজে বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হলো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(মায়েদাহ ৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে সন্ত্রাস করতে যেও না। আল্লাহ শান্তি ভঙ্গকারীকে (সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীকে) ভালবাসেন না' *(ক্বাছাছ ৭৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না' *(আ'রাফ ৫৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং সে ঈমানকে শিরকের পংকিলতা দ্বারা কলুষিত করেনি, তারাই কেবল শান্তি ও নিরাপত্তার বাহক এবং শুধু তারাই সুপথ প্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*। উল্লিখিত আয়াত সমূহে সন্ত্রাসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত আয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা অন্বেষণকে ঈমানের সাথে একীভূত ও শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবিরোধী মনোভাব ও কর্মকাণ্ড সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। নবুওয়াতের পূর্বেই যুবক মুহাম্মাদ (ছাঃ) 'হিলফুল ফুযূল' গঠন করেন সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে এবং দুর্বল ও অসহায়দের রক্ষা করার জন্য। হাশিম ও মুত্তালিবের বংশধর এবং যোহরা ও তামীম পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'হিলফুল ফুযূল'-এর নীতিমালার প্রথম শর্ত ছিল- 'আল্লাহ্‌র শপথ! মক্কা নগরীতে কারো উপর অত্যাচার হলে আমরা সবাই মিলে অত্যাচারিতকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করব, সে ব্যক্তি উঁচু শ্রেণীর হোক বা নিচু শ্রেণীর, স্থানীয় হোক বা বিদেশী'। মানবজাতির প্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে অভিনন্দিত ৪৭টি ধারা সম্বলিত ঐতিহাসিক মদীনা সনদও সন্ত্রাস প্রতিরোধের এক অনন্য দলীল। এতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, 'যারা বিদ্রোহ করবে, পাপাচার করবে, বিদ্বেষ, দুর্নীতি বা ফাসাদ ছড়াবে আল্লাহভীরু মুমিনরা তাদের সমভাবে রুখে দাঁড়াবে, যদিও সে আপন পিতা বা পুত্র হয়'। হিজরতের পর প্রদত্ত প্রথম ভাষণেও মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'হে লোকসকল! চতুর্দিকে সালাম ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দাও। অভুক্তকে খাদ্য দাও। আর গভীর রাতে

মানুষ যখন সুপ্তিমগ্ন থাকে, তখন ছালাত আদায় কর। এর দ্বারাই চিরশান্তির আলয় জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে'।[১০৪]

দুনিয়ার বুকে মানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নীতিমালাই ইসলাম। রহমাতুল্লিল আলামীন মহানবী (ছাঃ) জঘন্য ও চরম বিদ্বেষী শত্রুকেও নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়াহশী, হিন্দা, আবু সুফিয়ান, সুরাকা বিন মালিক, ছাফওয়ান বিন উমাইয়াহ প্রমুখ নৃশংস নরাধমকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করেছেন। বিজিত মক্কাবাসীদের সবাইকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এমনকি মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে ক্ষমা করার জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেন (*তওবা ৮০*)। সেই মুনাফিকের অন্তিম বাসনা অনুযায়ী তার কাফনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়ের জামা খুলে দিয়েছিলেন।[১০৫] এহেন অতুল্য মানবহিতৈষী ও মানবদরদী ক্ষমাশীল নবী সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শিথিলতা, নম্রতা বা দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেননি। উকাইল ও উরাইনা গোত্রের ৭জন অসুস্থ লোককে সুস্থ হওয়ার জন্য তিনি সুযোগ দিলেও তাদের জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মৃত্যুদণ্ড দেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশেই ২০জন আনছার ছাহাবী সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে হত্যা করেন। বিশ্ব ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমাশীল ব্যক্তি মহানবী (ছাঃ)-এর আদেশে সন্ত্রাসীদের হাত-পা কেটে, চোখ উপড়ে মরুভূমির তপ্তরোদে ফেলে রাখা হয়। পানির জন্য আর্তনাদ করলেও তাদের পানি দেওয়া হয়নি।[১০৬] সন্ত্রাসের উৎস নির্মূল করার জন্য মহানবী (ছাঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনাকারী বনু নাযীর গোত্রকে ৬ দিন অবরোধ করে রাখার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে বাগান পুড়িয়ে দেওয়া হয়।[১০৭] তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় বিশৃংখলা সৃষ্টির। এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, 'তোমরা খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখেছ, তাতো আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই; তা এজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করেন' (*হাশর ৫*)। সন্ত্রাসতো দূরের কথা কোন অন্যায়-অবিচার, অনাচারকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বরদাশত করেননি। অপরাধীর সামাজিক বা বংশমর্যাদার প্রতিও তিনি কোন ভ্রূক্ষেপ করেননি। সম্ভ্রান্ত মাখযূমী গোত্রের ফাতিমা নাম্নী অভিজাত এক মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির পরামর্শক্রমে উসামা বিন যায়েদ অপরাধিনীকে ক্ষমা করে দেওয়ার সুপারিশ করেন। ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক মহানবী (ছাঃ) বললেন, أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ ... وَأَيْمُ

১০৪. ***তিরমিযী,*** হা/১৮৫৫; হাদীছ ছহীহ, ***ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব,*** হা/২৬৯৭।
১০৫. ***নাসাঈ,*** হা/১৯০১, হাদীছ ছহীহ।
১০৬. ***বুখারী,*** হা/২৩৩; ***মুসলিম*** হা/১৬৭১; ***আবু দাউদ*** হা/৪৩৬৭; ***তিরমিযী*** হা/৭২, ১৮৪৫, ২০৪২।
১০৭. ***বুখারী,*** হা/২৩২৬, ৪০৩২ 'জিহাদ' অধ্যায়; ***মুসলিম*** 'জিহাদ ও সারিয়া' অধ্যায়।

اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا– ‘তুমি কি আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি লংঘন করতে বলছ?... আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা চুরি করলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম’।[১০৮]

অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ফিরালেও আমরা দেখতে পাব মুসলিম দেশ সমূহে পূর্ববৎ অভিন্ন সম্প্রীতি, সহাবস্থান, পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা বিদ্যমান। হিজরতোত্তর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষিত ঐতিহাসিক ‘মদীনা সনদ’ তার গৌরবময় ঔজ্জ্বল্য নিয়ে অদ্যাবধি দেদীপ্যমান। সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান, পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে মৈত্রীর প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর বহনে এ সনদপত্র এক নযীরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গতঃ উলেখ্য যে, মহানবী (ছাঃ) নাজরান থেকে আগত খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে তাদের সান্ধ্যআরাধনা সম্পাদন করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় আগমন করে তখন সন্ধ্যা সমাগত। খৃষ্টানরা তাদের উপাসনা মসজিদের বাইরে গিয়ে সমাপ্ত করে আসার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ মসজিদে নববীর অভ্যন্তরেই তাদের উপাসনা সম্পন্ন করতে বলেন। একদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র কা‘বা ঘরের দিকে মুখ করে মাগরিবের ছালাতে ইমামতি করেন। অপরদিকে আগত খৃষ্টানরা বিপরীত মুখী অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে দাঁড়িয়ে তাদের উপাসনা সম্পন্ন করেন। মানবতার আদর্শের মূর্তপ্রতীক মহানবী (ছাঃ)-এর উদারতা-ঔদার্যে একই মসজিদের অভ্যন্তরে একই সময়ে দুই পৃথক মতের অনুসারীরা তাঁদের ইবাদত-আরাধনা সম্পাদন করলেন। এই হল ইসলামের প্রকৃত দীক্ষা।

একদা একটি শববাহী দল তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। ছাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অবহিত করলেন যে, সেটা জনৈক ইহুদীর শবানুগমন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘মৃত্যু একটি ভয়াবহ ঘটনা। সুতরাং তোমরা যখন কোন শববাহী দল দেখবে তখন উঠে দাঁড়াবে এবং সম্মান জানাবে’।[১০৯]

ইসলামের সহাবস্থান, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতার এই আদর্শ অন্য ধর্মে অনুপস্থিত। এই অনুপম আদর্শের বাস্তব নমুনা মহানবী (ছাঃ) মুখাইরিক আন-নাদারী নামক জনৈক ইহুদীকে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঐতিহাসিক ধর্মসমর ওহুদ যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী এবং খৃষ্টান ও ছাবীঈন, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের

---

১০৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত* হা/৩৬১০।
১০৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত* হা/১৬৪৯।

প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ৬২)*।

আমাদের প্রত্যেককেই অতীত ইতিহাস স্মরণ করা দরকার। কেননা ভবিষ্যতের পথ পরিক্রমায় তা সহায়ক হয়। উইন্সটন চার্চিল বলেন, The longer we can look back, the further we can look ahead. 'আমরা যত বেশি পিছনের দিকে তাকাতে পারব, ততই সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে পারব'। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অতি সহজেই পরিদৃষ্ট হবে যে, ইসলামের ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় চিত্রপটেও সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থান ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। পর ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ছিল সর্বশীর্ষে।

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এতে সন্ত্রাসের কোন স্থান তো নেই; বরং ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে সকল প্রকার সন্ত্রাস, নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণের হিংস্র অক্টোপাস থেকে মানবতাকে মুক্ত করে বিশ্বসমাজে শান্তির অনাবিল সমীরণ প্রবাহিত করার জন্য।

সন্ত্রাসের বিপক্ষে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কুরআন মাজীদে 'ফিৎনা' ও 'ফাসাদ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করে সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী হচ্ছে, وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না' *(আ'রাফ ৫৬)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك- 'শান্তি স্থাপনের পর ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও যে সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কেননা যখন কাজ-কারবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যথাযথভাবে চলতে থাকে, তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা হবে বান্দার জন্য বেশী ক্ষতিকর। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন'।[১১০]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন,

إنه سبحانه تعالى نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر-

'স্বল্প-বিস্তর যতটুকুই হোক শান্তি স্থাপনের পর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে কম বা বেশী যাই হোক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন'।[১১১]

---

১১০. হাফেয ইবনু কাছীর, ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,*** ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯ খৃ.), পৃঃ ২৩১।

১১১. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আনছারী আল-কুরতুবী, ***আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন,*** ৭ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ১৪৫।

পৃথিবীতে সন্ত্রাস বিরাজ করুক তা আল্লাহ আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি বলেন,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَيُحِبُّ الْفَسَادَ-

'যখন সে (মুনাফিক) প্রস্থান করে, তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ অশান্তি (সন্ত্রাস) পছন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২০৫)*।

সন্ত্রাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, -وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ 'ফিৎনা (সন্ত্রাস) নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ' *(বাক্বারাহ ২১৭)*। তিনি আরও বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. 'ফিৎনা (সন্ত্রাস) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর' *(বাক্বারাহ ১৯১)*।

সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যায়িত করে কুরআনে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' *(বাক্বারাহ ২৭)*। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، 'আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না' *(বনী ইসরাঈল ৩৩; আন'আম ১৫১)*। তিনি আরো বলেন, مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِيْ الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً- 'যে ব্যক্তি কাউকে কোন হত্যার পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল' *(মায়েদাহ ৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا 'যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও তার সুগন্ধ পাওয়া যায়'।[১১২]

পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিতে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত

১১২. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (রহঃ), ***ছহীহ বুখারী***, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাবি), হাদীছ নং ৩১৬৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৯৯ 'জিযয়া' অধ্যায়, 'বিনা অপরাধে যিম্মীকে হত্যাকারীর পাপ' অনুচ্ছেদ।

করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি' *(মায়েদাহ ৩৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا. 'যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তার উপর অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন' *(নিসা ৯৩)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তারা তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এরূপ কাজ করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা অপমানজনক অবস্থায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(ফুরক্বান ৬৮-৬৯)*।

ইসলাম মানুষকে জান-মাল, ইয্যত-আব্রু, দ্বীন ও বুদ্ধিমত্তা এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছে এবং এসব মৌলিক অধিকার বিনষ্ট করাকে হারাম করেছে।[১১৩] বিদায় হজ্জের ভাষণে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِىْ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِىْ بَلَدِكُمْ هَذَا– 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তোমাদের অপর ভাইয়ের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান আজকের এই দিনের মতো, এ মাসের মতো এবং এ শহরের মতোই হারাম'।[১১৪] তিনি আরও বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ، 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম'।[১১৫]

ইসলাম অনর্থক রক্ত ঝরানোকে অনুমোদন করে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধে যাবার সময় সেনাপতিদেরকে এই বলে উপদেশ দিতেন, أُغْزُوْا بِسْمِ اللهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ أُغْزُوْا وَلاَتَغُلُّوْا وَلاَتَغْدِرُوْا وَلاَتَمْثُلُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا وَلِيْدًا. 'তোমরা আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর, কিন্তু খেয়ানত কর না, চুক্তি ভঙ্গ কর না, অঙ্গবিকৃত কর না এবং শিশুদেরকে হত্যা কর না'।[১১৬] কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রণাঙ্গনে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।[১১৭]

১১৩. ***ফাতাওয়াল আইম্মা দিন-নাওয়াযিনিল মুদলাহম্মাহ***, পৃঃ ১২, ১৩৭।
১১৪. ***বুখারী***, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৬ হাদীছ নং ১৭৪১ 'হজ্জ' অধ্যায়; ***মুসলিম***, ৩য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি) পৃঃ ১৩০৫-৬, হা/১৬৭৯।
১১৫. ***মুসলিম***, হা/২৫৬৪, 'কিতাবুল বির্রে ওয়াছ ছিলাহ', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮৬।
১১৬. ***মুসলিম***, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫৭ 'জিহাদ' অধ্যায়।
১১৭. ***বুখারী***, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫, হাদীছ নং ৩০১৫ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'রণাঙ্গনে মহিলাদের হত্যা করার বিধান' অনুচ্ছেদ; ***মুসলিম***, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬৪।

উপরিউক্ত আলোচনায় সহজেই অনুমিত হয় যে, ইসলাম কখনও সন্ত্রাসকে লালন বা সমর্থন করেনি।

ইসলামে মানুষ হত্যা হারাম :

জঙ্গীরা ধর্মের নামে যে বর্বরোচিত ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে থাকে তা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইসলাম বিরোধী এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে রুখে দাঁড়ানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ তারা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈসলামিক কাজ করে ইসলামের নিষ্কলুষ আদর্শকে বিশ্বের দরবারে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। অথচ অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল। হত্যাকারী আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত, ক্রোধভাজন ও জাহান্নামী। আত্মঘাতী হামলা করাও শরী'আতে হারাম। এহেন ন্যক্কারজনক কাজ ইসলাম সমর্থন করে না। শুধু তাই নয়, কোন মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম। নিরপরাধ মানুষ হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে কোন হত্যার পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল' *(মায়েদা ৩২)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ায় মানব জাতির সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে মানুষের মনে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ পুরোপুরি বিদ্যমান থাকার উপর। সাথে সাথে একে অপরের জীবন রক্ষা ও স্থিতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্যকারী হওয়ার মানসিকতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ সংহার করে সে সমগ্র মানবতার দুশমন। কেননা তার মধ্যে যে দোষ পাওয়া যায় তা যদি সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে গোটা মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন যাপনের ব্যাপারে সাহায্য করে সে প্রকৃতপক্ষে মানবতারই বন্ধু ও সাহায্যকারী। কেননা যে গুণে মানবতার স্থিতি ও সুরক্ষা নির্ভরশীল তার মধ্যে তা পুরোপুরি বিদ্যমান।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا– 'তোমরা নিজেরা পরস্পরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ২৯)*। অন্যত্র হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'আর সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে। নিশ্চয়ই সে সাহায্যপ্রাপ্ত' *(বানী ইসরাঈল ৩৩)*। যে সকল ব্যক্তিকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তারা হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি, চুক্তিবদ্ধ কাফির, যিম্মী এবং

নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[১১৮]

অন্যত্র হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমনিকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সে তাতে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, তার উপর অভিশাপ করেন এবং তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৯৩)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে আল্লাহ তার জন্য চারটি বিষয় নির্ধারণ করেন। (১) এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। (২) এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। আর যার প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, সে আল্লাহ্র রহমত ও দয়ার আশা করতে পারে না। (৩) এরূপ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন। আর যার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন, সে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। (৪) এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ভুলবশতঃ মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার ন্যায় চুক্তিবদ্ধ কাফির ব্যক্তিকে হত্যার শাস্তি একই রূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কাফফারা ও রক্তমূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ রাববুল আলামীন কাফির মহিলা, শিশু, ধর্মযাজক ও বৃদ্ধদের হত্যা করা হারাম করেছেন। যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বাধা দান করে, বিরত রাখতে সচেষ্ট হয় ও তৎপরতা চালায় এবং যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে, কুফরকে প্রতিহত করতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনি ইসলামে ধর্মত্যাগী-মুরতাদদেরকেও হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা তওবা করে ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম ভঙ্গকারী কোন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুনরায় কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কারণ তারা হক্ব জেনে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর আবার জ্ঞাত অবস্থায় ধর্ম ত্যাগ করেছে। সুতরাং আক্বীদা-বিশ্বাস রক্ষা ও ঠিক রাখার জন্য তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর ইসলামে যে পাঁচটি বিষয় রক্ষার আবশ্যকতা বর্ণিত হয়েছে এটা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান যরূরী বিষয়। উল্লিখিত অবস্থাগুলি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং তাদের ইয্যত-সম্মান ও মান-সম্ভ্রম সংরক্ষিত থাকবে, এটাই ইসলামের বিধান।

হাদীছে এসেছে, عن أبي الدرداء يقول سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا– আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ

---

১১৮. ***ছহীহ বুখারী***, হাদীছ নং ৩১৬৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৯৯ 'জিযয়া' অধ্যায়, 'বিনা অপরাধে যিম্মীকে হত্যাকারীর পাপ' অনুচ্ছেদ।

হয়তো সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তাঁর সাথে শিরককারী বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না'।[১১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَنْ عبادة بن الصامت عن رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ قَتَلَ مُؤمنًا فَاغْتَبَطَ بقَتْله لَمْ يَقْبَلِ اللهُ منْهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً– ওবাদা ইবনুছ ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করবেন না'।[১২০] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে,

عن أبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لَا يَزَالُ الْمُؤمِنُ مُعْنِقًا صَالِحاً مَا لَمْ يُصِبْ دَماَ حَرَامًا–

আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি নেককার হিসাবে বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করবে'।[১২১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر– আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী'।[১২২] এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করে সে কুফরী কাজ করে।

ইসলামে অন্যায়ভাবে নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مسْعُوْد رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمِ يَشْهَدُ أنْ لاَّ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللهِ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِى وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِه الْمُفارِقُ لِلْجَماعَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'ব্যভিচার, হত্যা এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া অপরাধ ব্যতীত আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী কোন মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়'।[১২৩]

---

১১৯. ***আবুদাঊদ,*** হাদীছ নং ৪২৭০, হাদীছ ছহীহ।
১২০. ***ঐ***, হাদীছ ছহীহ।
১২১. ***ঐ***, হাদীছ ছহীহ, ***সিলসিলা ছহীহা*** হা/৫১১।
১২২. ***বুখারী, মুসলিম, মিশকাত***, হাদীছ নং ৪৮১৪।
১২৩. ***বুখারী,*** হাদীছ নং ৬৮৭৮; ***মুসলিম,*** হাদীছ নং ১৬৭৬।

অন্যত্র এসেছে, عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ– আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহ্র নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর বিষয় হচ্ছে মুসলিমকে হত্যা করা'।[১২৪]

মুসলিম কখন হত্যাযোগ্য :

একজন মুসলমান বিভিন্ন কারণে হত্যাযোগ্য হতে পারেন। এক্ষেত্রে ঐ মুসলমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হতে হবে। কোন ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করলে সে মুরতাদ হবে। আর মুরতাদ প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করতে হবে এটাই ইসলামী বিধান। মুরতাদ প্রমাণের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করলে, তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من بدل دينه فاقتلوه 'যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলবে, তোমরা তাকে হত্যা কর'।[১২৫] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, الإيمان قيد الفتـــك لا يفتـــك مؤمن– 'ঈমান কোন লোককে হঠাৎ হত্যা করা হতে বিরত রাখে। সুতরাং কোন মুমিন যেন কোন লোককে হঠাৎ হত্যা না করে'।[১২৬]

ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী মানব জাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র দ্বীন। কোনভাবেই উগ্র, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী তৎপরতাকে ইসলাম সমর্থন করে না। বরং ইসলাম সকল প্রকার সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতাকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সন্ত্রাসী ব্যক্তি ও দলের জন্য যথাযথ শাস্তির বিধান দিয়েছে। যাতে এই অপকর্ম চিরতরে বন্ধ হয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। আর ইসলামী শরী'আতে 'হদ' বা শাস্তির বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব হচ্ছে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের। কোন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির নয়।

মুসলমান কোন বড় ধরনের অপরাধ করলে তার জন্য ইসলামে তওবার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী প্রমাণিত হলে কেবল মুসলিম শাসক তাকে হত্যা করতে পারেন। হত্যাযোগ্য অপরাধ হচ্ছে- (১) কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। (২) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে। (৩) ইসলাম ত্যাগ

---

১২৪. ***তিরমিযী,*** হাদীছ নং ১৩৯৫ হাদীছ ছহীহ।
১২৫. ***বুখারী,*** হাদীছ নং ৩০১৭।
১২৬. ***আবুদাঊদ,*** হা/২৭৬৯, হাদীছ ছহীহ, ***মিশকাত,*** হা/৩৫৪৮; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত***, হা/৩৩২৯।

করলে।[১২৭] (৪) কোন ব্যক্তি রাসূলুলাহ (ছাঃ)-কে গালি দিলে অথবা রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।[১২৮] (৫) যাদু শিখলে বা যাদু চর্চা করলে।[১২৯] অবশ্য এসব ক্ষেত্রে তওবা করলে মুক্তি পাবে।

মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম :

মানুষকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা ইসলামে জায়েয নয়। তেমনি তাকে হত্যার হুমকি দেয়াও ইসলামে নেহায়েত অন্যায়। এমনকি একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে হাত ও মুখ দ্বারা কোনভাবে কষ্ট দিতে পারে না। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله لا يحل لمسلم أن يروع مسلما-

ইবনু আবী লায়লা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলেছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সফর করতেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে তাদের এক সঙ্গী একটি রশির দিকে অগ্রসর হল, যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির নিকট ছিল এবং এই লোক সে রশিখানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিসহ ঐ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে অন্য কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করবে'।[১৩০] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। কাজেই বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয়।

কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা ইসলামে নিষিদ্ধ :

কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী এবং তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হারাম। তেমনি মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করাও ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। এসম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীছ আমরা এখানে উল্লেখ করছি- عن عبد الله عمر رضى الله عنه قال: إنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا– আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

১২৭. ***বুখারী, মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৪৪৬।
১২৮. ***আবুদাউদ, মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৫৪৯।
১২৯. ***তিরমিযী, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৫৫১।
১৩০. ***আবুদাউদ,*** হাদীছ নং ৫০০৪; হাদীছ ছহীহ, ***মিশকাত***, হাদীছ নং ৩৫৪৫।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৩১]

عن سلمة بن الأكواع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السيف فليس منا– সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করল সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৩২] সুতরাং যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা মুসলমানের রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। তেমনি বর্তমানে যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করছে এবং বোমা মেরে নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। তাদেরকে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাদের কোন সহযোগিতা করা যাবে না। তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়-প্রশ্রয়ও দেয়া যাবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিতে হবে।

কোন মুসলিমকে হুমকি দেওয়া হারাম :

অস্ত্র বা ঐ জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা কোন মুসলমানকে হুমকি দেওয়া ও ভয় দেখানো ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। সেটা স্বেচ্ছায় হোক বা হাসি-তামাশার ছলেই হোক। এমনকি মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তলোয়ার খোলা অবস্থায় বহন করা থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِّنْ النَّارِ. 'তোমাদের মাঝে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা যেন ইশারা না করে। কেননা হতে পারে যে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হস্তদ্বয়ে আঘাত হানার ফলে হতাহত সংঘটিত হবে। অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১৩৩] অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ কারো প্রতি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আঘাত করা তো দূরের কথা অস্ত্র দ্বারা ইশারাও করতে পারে না। কারণ শয়তান সর্বদা মুসলমানের দ্বারা অঘটন ঘটাবার সুযোগ অনুসন্ধান করতে থাকে।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّى يَدْعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. 'কোন ব্যক্তি যদি অস্ত্র দ্বারা তার ভাইকে হুমকি দেয়, তবে তা

১৩১. *বুখারী*, হাদীছ নং ৭০৭০; *মুসলিম*, হাদীছ নং ৯৮।
১৩২. *মুসলিম, মিশকাত*, হাদীছ নং ৩৫২১; *বঙ্গানুবাদ মিশকাত*, হাদীছ নং ৩৩৬৬।
১৩৩. *বুখারী*, হাদীছ নং ৭০৭২; *মুসলিম*, হাদীছ নং ২৬১৭।

থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন, যদিও হুমকি প্রদানকৃত ব্যক্তি তার সহোদর ভাই হয়'।[১৩৪]

আত্মঘাতী হামলা ইসলামে অবৈধ :

আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। ধর্মের নামে আত্মহত্যাকারীরাও জাহান্নামী। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আত্মহত্যাকারী ছাহাবীকেও জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন। আত্মহত্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَـةِ وَأَحْـسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِـبُّ الْمُحْـسِنِيْنَ– 'আর তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর মানুষের সাথে সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ আত্মহত্যাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ স্পর্কে অনেক হাদীছও এসেছে, যাতে আত্মহত্যাকে হারাম করা হয়েছে। মানবাত্মা সম্মানিত বলেই আল্লাহ আত্মহত্যা হারাম করেছেন, সেটা যে কারণেই হোক না কেন। আল্লাহ পাক বলেন, 'আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ সীমালংঘন কিংবা যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপে করা হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজসাধ্য' *(নিসা ২৯-৩০)*।

সুতরাং আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে এটাকে সৎকাজ বলে বাহ্বা নেওয়ার প্রচেষ্টা কিংবা ধ্বংসাত্মক কাজে আত্মহত্যা করে তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ বলে আখ্যায়িত করে শাহাদত লাভের ধারণা যারা করে, তারা জাহান্নামে যাওয়ার এবং শাস্তি পাওয়ার হক্বদার হয়ে যায়। তাই এসব কর্মকাণ্ডকে জিহাদ বলার কোন অবকাশ নেই; বরং জিহাদ এসব কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা। তদ্রূপ যেসব কাজে শারঈ কোন কল্যাণ নিহিত নেই সেসব অকল্যাণকর, অনিষ্টকর, ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর কাজে নিজেকে সোপর্দ ও সম্মুখীন করাও বৈধ নয়।

মূলতঃ মানবাত্মা ততক্ষণ সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী থাকবে, যতক্ষণ সে ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কুফরী ও আল্লাহ্র নাফরমানী বা অবাধ্যতা দ্বারা নিজেকে অসম্মানিত ও অপমানিত না করবে। আল্লাহ পাক বলেন, 'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে,

---

১৩৪. *মুসলিম*, হাদীছ নং ২৬১৫।

সে ব্যর্থ মনোরথ হয়' *(শামস ৭-১০)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচ থেকে নিচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার' *(তীন ৪-৭)*।

আত্মহত্যা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন হল।-

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جـــرام فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة–

জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথা দুঃসহ বোধ করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, 'আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম'।[১৩৫]

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم–

ছাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে জাহান্নামে তাকে লৌহাস্ত্র দ্বারা সর্বক্ষণ শাস্তি দেয়া হবে'।[১৩৬]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخنـــق نفـــسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنـــها في النـــار–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে'।[১৩৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ

---

১৩৫. ***বুখারী,*** হা/১৩৬৪।
১৩৬. ***বুখারী,*** ১ম খণ্ড, ১৮২।
১৩৭. ***বুখারী, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৪৫৪, 'কিছাছ' অধ্যায়।

পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই লৌহাস্ত্র থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সেটি ঢুকাতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান'।[১৩৮]

উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে বস্তু তার হাতে থাকবে এবং সে তথায় সর্বক্ষণ তা দ্বারা আত্মহত্যা করতে থাকবে। এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান। ধর্মের নামে কেউ আত্মহত্যা করলেও তার পরিণতি হবে অভিন্ন। সুতরাং ধর্মের নামে এসব আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরাও জাহান্নামে একইভাবে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তোফাইল ইবনু আমর দাওসীও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করে আসলেন। তার সাথে তার স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তি হিজরত করে এসেছিল। সে এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার দরুণ লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা তার হাতের গিরা কেটে ফেলল। ফলে এমনভাবে হাত হতে রক্তক্ষরণ হল যে এতেই তার মৃত্যু হল। পরে তোফাইল ইবনু আমর তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থা এবং বেশভূষা খুবই সুন্দর কিন্তু তার হাত দু'খানা কাপড় দ্বারা ঢাকা। তখন তোফাইল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, আল্লাহ আমাকে তাঁর নবীর নিকট হিজরত করার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোফাইল আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আমি তোমার হাত দু'খানা ঢাকা দেখছি কেন? সে বলল, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমাকে বলা হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ, আমি তা কখনো ঠিক করব না। এ স্বপ্ন দেখার পর তোফাইল (রাঃ) ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার হাত দু'খানাকেও মাফ করে দাও'।[১৩৯]

এ হাদীছ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মহত্যা তো দূরের কথা কোন মানুষই তার নিজের শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গই নষ্ট করতে পারে না। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করা বা অকেজো করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গ

---

১৩৮. ***বুখারী,*** ২য় খণ্ড, ৮৬০ পৃঃ।
১৩৯. ***মুসলিম, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৪৫৬; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৩০৮।

নষ্ট করে, তাহলে আল্লাহ তার সে নষ্ট অঙ্গকে পরকালে ঠিক করে দিবেন না। কাজেই আত্মঘাতী বোমাবাজরা ক্ষমা পাবে এ আশা করা যায় না।

ছহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। রাবী বলেন, এ কথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তারা এ সম্পর্কিত কথা বার্তায় রয়েছেন, এ সময় খবর আসল যে, লোকটি মরেনি; বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে না পেরে আত্মহত্যা করল। তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ দেওয়া হল। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্য ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে পাপী লোকদের দ্বারা সাহায্য করে থাকেন'।[১৪০]

ইসলামে অমুসলিমদের সাথে আচরণের বিধান :

ইসলামে অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা বিদ্রোহ না করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কারে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই অত্যাচারী' *(মুমতাহিনা ৮-৯)*।

অনুরূপভাবে মুসলিম সন্তানের জন্য আবশ্যক হল কাফির পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. 'দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ

১৪০. *বুখারী,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩০।

অনুসরণ করবে' *(লোক্বমান ১৫)*। মুসলিম পুরুষের জন্য আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বী মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. 'তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে' *(মায়েদাহ ৫)*।

শুধু তাই নয়, অমুসলিমদেরকে শিরক ও কুফরের তিমির থেকে তাওহীদের আলোকিত রাজপথের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়াও মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা মানবাত্মা সম্মানিত, তাই তাকে হেফাযত করাও অতীব যরূরী। তবে যে সকল অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণের দৃষ্টিতে তাদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঐ সকল অবস্থা ব্যতীত।

বিচার-ফায়ছালার ক্ষেত্রেও অমুসলিমদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সে বিষয়েও আল্লাহ তা'আলা নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'অতএব তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিন, নতুবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফায়ছালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফায়ছালা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন' *(মায়েদাহ ৪২)*।

যেসব কারণে কোন মানুষকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ সেসব কারণ না পাওয়া গেলে অযথা কোন মানুষকে হত্যা করা ইসলামী শরী'আতে বৈধ নয়। যদিও সে ব্যক্তি অমুসলিম হয়। এসম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, 'অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন' *(বানী ইসরাঈল ৩৩)*।

কুরআন ও হাদীছের উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা জিহাদ বা ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের নামে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বোমা হামলা করে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তারা নিছক সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কাজ করছে। যারা এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারা ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতির শত্রু।

পরিশেষে আমরা বলব, বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র শোষণ, নির্যাতন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মূলে রয়েছে শোষকগোষ্ঠী ইঙ্গ-মার্কিন দুষ্টচক্র ও তাদের দোসররা। ইসলামের উত্থান তাদের বাধাহীন শোষণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। তাই তারা একে সর্বত্র ভয়ের চোখে দেখছে। অন্ধকারে ভূত দেখে আঁতকে ওঠার ন্যায় তারা এখন সর্বত্র মুসলিম জঙ্গী দেখছে। মূলতঃ ইসলামের মূলশক্তি ও অস্ত্র লুকায়িত আছে তার কালজয়ী ও বিশ্বজয়ী আদর্শের মধ্যে। বোমা মেরে সেটাকে হত্যা করা সম্ভব নয়।

জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত

১. সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে,

من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد فى الأرض التى تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس و الممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك: فإن عقوبته القتل.

'শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রমাণিত হয় যে, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং ব্যক্তিগত বা সরকারী সম্পত্তি যেমন বাসস্থান, মসজিদ, মাদরাসা, মেডিকেল, কারখানা, ব্রিজ-কালভার্ট, অস্ত্রাগার, পানি সংরক্ষণাগার, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়ের উৎস যেমন পেট্রোলের পাইপ, বিমান বিধ্বংস করা বা ছিনতাই করা ইত্যাকার নাশকতামূলক ও শান্তি বিঘ্নিতকারী কোন সন্ত্রাসী কাজ করেছে, তবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা'।[১৪১]

২. সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত হতে হবে উত্তম পন্থায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কুরআন ও হাদীছে যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের মাধ্যম হচ্ছে উপদেশ প্রদান, বক্তব্য উপস্থাপন, উৎসাহ দান এবং আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা, যেভাবে মক্কায় নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে করেছিলেন। তারা অস্ত্রের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে লোকদেরকে দাওয়াত দেননি। গুপ্তহত্যা অথবা মারধর করে দাওয়াতী কার্যক্রম তরান্বিত করা নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের তরীকা নয়'।[১৪২]

৩. সঊদী আরবের খ্যাতনামা আলেম শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীনের অভিমত : ১৪১৭ হিজরীর ১০ ছফর সঊদী আরবের খুবার এলাকায় এক বোমা বিস্ফোরণে ১৮ জন নিহত ও ৩৮৬ জন আহত হয়। এ প্রেক্ষিতে সেখানকার প্রখ্যাত আলেম শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন الحادث العجيب فى البلد الحبيب শিরোনামে একটি বক্তব্য দেন। এতে তিনি এ সন্ত্রাসী কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ولاشك أن هذه العملية لايقرها شرع ولا عقل

১৪১. মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন সাঈদ আলে সুফরান আল-ক্বাহতানী সংকলিত ও ড. ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান সম্পাদিত, ***ফাতাওয়াল আইম্মাহ ফিন-নাওয়াযিল আল-মুদলাহাম্মাহ*** (রিয়াদ : ১৪২৪ হিঃ), পৃঃ ১৪।

১৪২. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, ***মাজমূউ ফাতাওয়া***।

–ولافطرة 'নিঃসন্দেহে এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলামী শরী'আত, বিবেক-বুদ্ধি ও ফিতরাত কোনটাই সমর্থন করে না'।

তিনি আরো বলেন, فأخلاق الاسلام صدق وبر ووفاء والدين الاسلامى يحذرمن هذا وأمثاله أشد التحذير– 'মুসলিমের চরিত্র সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও অঙ্গীকার পূরণের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আর ইসলাম ধর্ম এ ঘটনা ও এ জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছে'।

উক্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষণে তিনি আরো বলেন, فمن اظهر لنا إسلامه فنفسه محرمة وإن عمل ما عمل من المعاصي التي لم يدل القران ؤ السنة على انها تبيح قتله– 'যে ব্যক্তি আমাদের কাছে তার ইসলামকে প্রকাশ করবে তার জীবন হারাম তথা হত্যা থেকে নিরাপদ। যদিও সে এমন কিছু পাপ করে যার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ তার হত্যার বৈধতা প্রদান করে না'।[১৪৩]

৪. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন,

وبأى عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المبانى على من فيها؟

'সাধারণ মানুষ, মুসলমান ও যিম্মীদেরকে হত্যা করা, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা, মহিলাদেরকে বিধবা করা, শিশুদেরকে ইয়াতীম করা এবং স্থাপনা ধ্বংস করা কোন জ্ঞান ও দ্বীনের আলোকে জিহাদ হতে পারে'?[১৪৪]

৫. সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এক ফৎওয়ায় বলেছে,

إن الإسلام برئ من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجرى فى بعض البلدان من سفك للدماء البريئة، وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت: هو عمل إجرامى، والإسلام برئ منه وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر برئ منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف، وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلايحتسب عمله

---

১৪৩. পূর্ণ ভাষণটির জন্য দেখুন : মুহাম্মাদ বিন নাছির আল-আরীনী, ***আত-তাহযীরু মিনাত তাসাররু ফিত-তাকফীর***, পৃঃ ৫৩; www.sahab.net/forums/showthread.php?p=329648.

১৪৪. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ***বিআইয়ি আক্বলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকূনুত তাফজীরু ওয়াত তাদমীরু জিহাদান*** (রিয়াদ : দারুল মুগনী, ১৪২৪হিঃ/২০০৩ খৃঃ), পৃঃ ১৬।

على الإسلام، ولاعلى المسلمين المهتدين بهدى الاسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة-

‘ইসলাম এহেন ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে মুক্ত। আর কতক মুসলিম দেশে নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্তপাত, বাসস্থান ও গাড়ীতে বিস্ফোরণ ঘটানো, স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করা ইত্যাদি যা ঘটছে তা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। আর ইসলাম এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সকল খাঁটি মুসলিম এথেকে মুক্ত। এগুলি তো কেবল ভ্রান্ত আক্বীদাহ ও বিকৃত চিন্তাধারার লোকদের কাজ। সুতরাং এসব কাজের পাপ ও দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে এসবের দায়ভার ইসলামের উপর কিংবা কিতাব ও সুন্নাহ্র সুদৃঢ় রশির ধারক-বাহক খাঁটি মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোনই সুযোগ নেই। এসবতো কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক ও পাপ কাজ, যা শরী‘আত বহির্ভূত ও বিবেক বর্জিত’।[১৪৫]

৬. সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য ড. ছালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান বলেন, কা‘ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনা গুপ্তহত্যা জায়েয বা বৈধ হওয়ার দলীল নয়। কারণ কা‘ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে, যিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। কা‘বের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা চুক্তি লংঘিত হওয়ায় মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ হয়েছিল। তাকে হত্যার বিষয়টি রাষ্ট্রের পরিচালককে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ হতে ছিল না। যেমনটি বর্তমান যুগের গুপ্তহত্যাগুলোর ক্ষেত্রে ঘটছে। ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্যে অভাবনীয় ক্ষতি সাধনের আশংকা থাকায় এরূপ তৎপরতাকে ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না।[১৪৬]

জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ড. গালিবের আপোষহীন বক্তব্য :

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত, দক্ষিণ এশিয়ার খ্যাতিমান আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত ‘ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি’ বইটি মাসিক **আত-তাহরীক** জুলাই ২০০৩ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ ‘দরসে কুরআনে’ ‘দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি’ শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর মার্চ ২০০৪ সালে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত

---

১৪৫. সঊদী আরবের ওযারাতুশ শুঊনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল-আওক্বাফ ওয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ কর্তৃক প্রকাশিত ‘বায়ানু হায়আতি কিবারিল ওলামা হাওলা খুতূরাতিত তাসাররু‘ ফিত-তাকফীর ওয়াল কিয়াম বিত-তাফজীর’ (بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع فى التكفير والقيام بالتفجير) শীর্ষক লিফলেট, পৃঃ ৭।

১৪৬. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, ***মাজমূ‘উ ফাতাওয়া***।

বইয়ে তিনি জঙ্গীদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য তুলে ধরেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তব্য বিধৃত হ'ল-

□ 'জানা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সশস্ত্র 'দারোগা' রূপে প্রেরণ করেননি *(গাশিয়াহ ২২)*। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত' হিসাবে *(আম্বিয়া ১০৭)*। তাই 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।[১৪৭]

□ 'তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হ'ল সবচেয়ে বড় 'জিহাদ'। নবীগণ সেই লক্ষ্যেই তাঁদের সমস্ত জীবনের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন। আর সেটা করতে গিয়েই তাঁদের উপর নেমে এসেছিল বাধা ও বিপদের হিমালয় সদৃশ মুছীবত সমূহ। জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত ইবরাহীমকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তরতাজা নবী যাকারিয়াকে সর্বসমক্ষে জীবন্ত করাতে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। মূসাকে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। ঈসাকে পৃথিবী ছেড়ে আসমানে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমাদের নবীকে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় অবস্থান নিতে হয়েছে। কারণ তাঁরা স্ব স্ব যুগের লোকদের প্রতিষ্ঠিত শিরকী আক্বীদার সংস্কার ও সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্র দাসত্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা কেউই অস্ত্র হাতে নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হননি। বরং যখনই শিরকের শিখণ্ডীরা অস্ত্র হাতে তাদেরকে উৎখাতের জন্য উদ্যত হয়েছে, তখনই তাওহীদের অনুসারীগণ তাদের মুকাবিলায় হয় তাদের জীবন দিয়েছেন, নয় আত্মরক্ষা করেছেন, শহীদ অথবা গাযী হয়েছেন। বদর, ওহোদ, খন্দক সকল যুদ্ধই হয়েছে মদীনায় আত্মরক্ষামূলক। যদি আক্রমণমূলক হ'ত, তাহ'লে এসব যুদ্ধ মক্কায় সংঘটিত হ'ত এবং তখন রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হতেন। কিন্তু ইতিহাস সেকথা বলেনি। বাস্তব কথা এই যে, জবরদস্তির মাধ্যমে একজনকে সাময়িকভাবে পদানত করা যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে অনুগত করা যায় না। ইসলাম আল্লাহ্র সর্বশেষ নাযিলকৃত ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এ দ্বীন মানবজীবনকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুগত বান্দায় পরিণত করতে চায়। অতএব দ্বীন কায়েমের নামে কিংবা

১৪৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি, ***মাসিক আত-তাহরীক***, জুলাই'০৩, পৃঃ ৮; ***ইক্বামতে দ্বীন***, পৃঃ ২৭।

জিহাদের নামে আমরা যেন অতি উৎসাহে এমন কিছু না করি, যা ইসলামের মূল রূহকে ধ্বংস করে দেয়'।[১৪৮]

☐ 'তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমে'র অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদে'র অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উষ্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা'।[১৪৯]

☐ 'এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। ...মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে'।[১৫০]

☐ 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য'।[১৫১]

☐ 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক- এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়'।[১৫২]

☐ 'এযুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হ'ল তিনটি : কথা, কলম ও সংগঠন'।[১৫৩]

---

১৪৮. ***ঐ***, পৃঃ ২৮; দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি, ***মাসিক আত-তাহরীক***, জুলাই'০৩, পৃঃ ৯।
১৪৯. ***ইক্বামতে দ্বীন***, পৃঃ ৩১।
১৫০. ***ঐ***, পৃঃ ৩৩।
১৫১. ***ঐ***, পৃঃ ৩৫; দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি, ***মাসিক আত-তাহরীক***, জুলাই'০৩, পৃঃ ১১-১২।
১৫২. ***ইক্বামতে দ্বীন***, পৃঃ ৩৯।
১৫৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ***সমাজ বিপ্লবের ধারা*** (রাজশাহী : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃঃ ১৬।

□ কারামুক্তির পর প্রথম সাক্ষাৎকারে ড. গালিব বলেন, ইসলাম সবসময় মধ্যপন্থী নীতি অবলম্বন করে আসছে। ... ইসলাম কখনও চরমপন্থায় বিশ্বাস করে না। মানুষকে ধরে রগ কাটা, পঙ্গু করা, মিথ্যা মামলায় জেল খাটানো সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। কারা করছে এসব? রাজনৈতিক কারণে, ভিলেজ পলিটিক্সের কারণে মানুষকে মারধর করা হচ্ছে। রিমান্ডে নিয়ে পুলিশের যে নির্যাতন তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। কেন এগুলো হবে স্বাধীন দেশে। আমরা এসবের বিরোধী। **শুধু ইসলামী জঙ্গিবাদ নয়। গণতান্ত্রিক জঙ্গিবাদ, কমিউনিস্ট জঙ্গিবাদসহ সব ধরনের জঙ্গিবাদের আমরা ঘোর বিরোধী।** ইসলাম একটি সুন্দর, সুনিবিড় দেশ চায়। যেখানে থাকবে পরস্পরের ভালবাসা। তিনি বলেন, আহলে হাদীস আন্দোলন কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়তে চায়। চায় জাতীয় ঐক্য। তিনি বলেন, ... যারাই জঙ্গিবাদ বা চরমপন্থি মতবাদ নিয়ে সামনে আসবে, হোক ইসলামের নামে, গণতন্ত্রের নামে বা কমিউনিজমের নামে তাদেরকে বয়কট করতে হবে।[১৫৪]

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের লেখা জঙ্গীবাদ বিরোধী অবিস্মরণীয় সম্পাদকীয়

প্রকৃত জিহাদই কাম্য :

সম্প্রতি কিছু তরুণ জয়পুরহাটে ধরা পড়েছে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সেজন্য সর্বত্র নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে সরকার ও জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল করতে চায় বলে পত্র-পত্রিকায় বক্তব্য এসেছে। এরা নাকি আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলিকে ঘাঁটি করে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন পত্রিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কে জঙ্গী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে খবর প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সাথে আহলেহাদীছ জামা'আতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম ও দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল (রহঃ)-এর নামে কুৎসা রটিয়ে বলেছে, 'একাত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল একজন দুর্ধর্ষ আল-বদর ছিলেন। একাত্তরে তার কুখ্যাতির নানা কাহিনী এখনও মানুষের মনে গেঁথে আছে'। আমরা উপরোক্ত মন্তব্যসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছি যে, যদি আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলিকে এভাবে ঢালাওভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের শ্রদ্ধেয় আলেমদের সম্পর্কে এই ধরনের ভিত্তিহীন ও নোংরা মন্তব্য করা হয়, তাহলে এদেশের দু'কোটি আহলেহাদীছের মধ্যে ক্ষোভ ধুমায়িত হবে, যা এক সময় জাতীয় ক্ষোভে পরিণত হবে। মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল এক ওয়ায মাহফিলে বক্তৃতার জন্য এসে **১৯৮৪** সালের **২১**শে এপ্রিল শনিবার দিবাগত

১৫৪. *দৈনিক মানব জমিন,* ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১।

রাতে তাহাজ্জুদের সময় রাজশাহীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শায়িত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি সারা দেশে বক্তৃতা করে ফিরেছেন। সর্বস্তরের জনগণ তাঁর ঈমানবর্ধক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করত ও আখেরাতে মুক্তির জন্য কেঁদে বুক ভাসাতো। সরকার ও জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোন কুকীর্তির অভিযোগ উত্থাপন করেনি। অথচ স্বাধীনতার ৩২ বছর পর এসে ছেলের কোন অপরাধের কারণে তার মরহুম পিতাকে দায়ী করা কতটুকু সঙ্গত হয়েছে, তরুণ রিপোর্টার ও বিজ্ঞ সম্পাদকদের তা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত ছিল। এদেশে বিদেশী খৃষ্টান এনজিওগুলির খপ্পরে পড়ে হাযার হাযার হিন্দু-মুসলিম নাগরিক প্রতিনিয়ত খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। যাদের নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূরের মত অবস্থা বাংলাদেশে যেকোন সময় হতে পারে। সেদিকে ঐসব বাম ঘেঁষা পত্রিকাগুলির কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের হাতে গনা দু'চারটি ইসলামী দাতা সংস্থা নিঃস্বার্থভাবে এদেশের দ্বীন ও সমাজের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই তাদের যত অন্তর্জ্বালা। বিষয়টি বুঝতে মোটেই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

জানা আবশ্যক যে, সকল ইসলামপন্থী দল ও ওলামায়ে কেরামের ন্যায় মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও নিখাদ দেশপ্রেমিক নেতা এবং সেদিনের ন্যায় আজও এদেশের ইসলামপন্থী শক্তিই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। ভিতর ও বাহিরের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র সবসময় এদেশের ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করতে চেয়েছে। এতদিন পর পলিসি পরিবর্তন করে এখন তারা মুছল্লী সেজে মসজিদে ঢোকার পলিসি গ্রহণ করেছে। দেশের বাম ও বাম ঘেঁষা দলগুলির ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখন ইসলামী দলগুলির মধ্যে তাদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় যদি আহলেহাদীছদের কোন ছেলেকে হাত করে তারা তাদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা তাতে দু'টি স্বার্থ হাছিল হবে। ১-'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃত্বে অগ্রগামী বর্তমানে সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ আহলেহাদীছ জনশক্তিকে ভিতর থেকে দুর্বল করা। ২- শিরক ও বিদ'আত মুক্ত নির্ভেজাল ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে জনগণকে অন্ধকারে রাখা।

অতএব যদি বাংলাদেশে জিহাদ ও ইসলামের নামে কোন সশস্ত্র সংগঠন থেকেই থাকে, তবে তার উৎস বাংলাদেশে নয়, বরং ইসলাম বৈরী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। 'হিন্দুস্তান টাইমস' ২০০২-এর প্রথম দিকেই বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ'কে জঙ্গী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেছিল। এতদিন পরে তাদের অনুসারী পত্রিকাগুলির মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, 'আহলেহাদীছ' বলতে তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কেই বুঝাতে

চেয়েছে। কেননা এ সংগঠনের মূল শ্লোগান হ'ল- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ'। 'আমাদের রাজনীতি, ইমারত ও খেলাফত'। 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। ইসলামের এই মৌলিক শ্লোগানগুলি ইসলাম বিরোধী শক্তির বুকে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় বিদ্ধ হয়। তাই তারা প্রথমে 'দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি' নামে বই লিখে সেখানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু আহলেহাদীছ তরুণকে বিভ্রান্ত করে। অতঃপর তাদের দিয়েই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মূল নেতাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। এছাড়াও রাজনৈতিক হয়রানি গত কয়েক বছর থেকেই চলছে।

আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমরা সর্বদা দাওয়াত ও জিহাদে বিশ্বাসী। 'জিহাদ' ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। মুমিনের যিন্দেগী প্রতি মুহূর্তে জিহাদের যিন্দেগী। মুসলমান যখনই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তখনই তার উপরে আল্লাহর গযব নেমে আসবে। এই জিহাদ হবে সর্বদা নিজের প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের বিরুদ্ধে, যাবতীয় শয়তানী আদর্শের বিরুদ্ধে, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী যাবতীয় আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে। শান্ত অবস্থায় এই জিহাদ হবে কথা, কলম ও জনমত সংগঠনের মাধ্যমে। কিন্তু দেশের উপর সশস্ত্র হামলার সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক সক্ষম আহলেহাদীছ নরনারী হাতে অস্ত্র তুলে নিবে এবং ইসলামের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হাসিমুখে বুকের তপ্ত-তাযা খুন ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা নিছার আলী তীতুমীর, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বেই এক সময় ভারতবর্ষে জিহাদ আন্দোলন হয়েছিল। তাঁদেরই রক্তভেজা পথ বেয়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করেছি। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আহলেহাদীছগণ আবারও সশস্ত্র জিহাদের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিতে মোটেই কসুর করবে না ইনশাল্লাহ। তবে বর্তমান অবস্থায় এগুলি জিহাদের নামে সন্ত্রাস ব্যতীত কিছুই নয়। এসবের সাথে প্রকৃত জিহাদের কোনই সম্পর্ক নেই। মুমিন হিসাবে আমাদের নিকটে প্রকৃত জিহাদই কাম্য। এ প্রেক্ষিতে আমরা সরকারের নিকটে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, দেশের সকল মাদরাসা ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিন ও তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী তা'লীম দিন।

পরিশেষে আমরা বিদেশী শত্রুদের খপ্পরে পড়ে দেশের ও ইসলামের ক্ষতিকর তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। সাথে সাথে

সরকারী প্রশাসনকে দেশের সত্যিকারের বন্ধু যাচাই করে ধীর মস্তিষ্কে পা ফেলার অনুরোধ জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! (স.স.)[১৫৫]

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সাবেক খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের বক্তব্য :

১. আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে কোন মানুষকে মারা বা কোন নাগরিককে হত্যা করা ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে না। যারা আত্মঘাতী বোমা হামলা করে তারা ইসলামের নামে ইসলামী আইন অমান্য করছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী এসব কর্মকাণ্ড শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কাজের মাধ্যমে শহীদ হওয়া বা জেহাদ করা শরীয়তসম্মত নয়। যারা এসব করছে তাদের দমন করা সরকারের কর্তব্য।

২. আত্মহত্যা হারাম। তাছাড়া কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম খুনির বিচার করা হবে। মুমিন ব্যক্তির হত্যাকারী তাই জাহান্নামে যাবে। জঙ্গিবাদীরা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু যুবককে বিভ্রান্ত করছে। এটি ফেতনা। কুরআনে ফেতনাকে হত্যার চেয়েও বিপর্যয়কর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে যারা ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা শয়তানের অনুসারী।[১৫৬]

খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আলীমুদ্দীন নদিয়াভীর বক্তব্য :

যে ব্যক্তি ইসলামকে তার মহান ভিত্তি, মজবুত নীতিমালা ও প্রজ্ঞাময় দিক নির্দেশনাসহ অনুধাবন করেছে সে সঠিকভাবে অনুভব করতে পারবে যে, ইসলামের মাঝে আর জঙ্গিবাদীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী শারী'আতে এরূপ কাজ করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। এতে দ্বিমত পোষণের কোন সুযোগ নেই।[১৫৭]

দারুল উলূম দেওবন্দের ফৎওয়া :

ভারতের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ সন্ত্রাসবাদকে ইসলামবিরোধী বলে ফৎওয়া প্রদান করেছে। কয়েক হাজার আলেম ও ছাত্রের উপস্থিতিতে গত ৩১ মে'০৮ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর এক সম্মেলনে এ ফৎওয়া প্রদান করেন প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ শিক্ষকগণ। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে লড়াইয়ে নামারও ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

---

১৫৫. সম্পাদকীয়, ***মাসিক আত-তাহরীক***, সেপ্টেম্বর'০৩।

১৫৬. মোঃ মুখলেছুর রহমান (সংকলিত), ***সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও চরমপন্থা সম্পর্কে ইসলাম এবং আলিম-উলামাগণের অভিমত*** (ঢাকা : মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন, ২০০৫), পৃঃ ১২-১৩।

১৫৭. আলীমুদ্দীন নদিয়াভী, ***ইসলামের নামে সন্ত্রাস*** (মেহেরপুর : আলীমুদ্দীন একাডেমী, ২০০৬), পৃঃ ৪২।

দেওবন্দের অন্যতম শীর্ষ আলেম মাওলানা হাবীবুর রহমান নয়াদিল্লী সম্মেলনে ঐ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পড়ে শোনান। তিনি বলেন, সব ধরনের অন্যায্য সহিংসতা, শান্তি বিনষ্টকারী কার্যকলাপ, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ ইসলামবিরোধী এবং ইসলাম এসবের কোনটিকেই সমর্থন করে না। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ উপড়ে ফেলে বিশ্বশান্তির বার্তা প্রচারের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল।[১৫৮]

ভারতের কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য :

ভারতের কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে জড়ানোর ঘোর বিরোধিতা করেছেন। গত ১৫ জুন'০৮ রবিবার কলকাতায় একটি মুসলিম এনজিও আয়োজিত 'টেরোরিজম এন্ড জাস্টিস' শীর্ষক সেমিনারে প্রণব মুখার্জী এই মতামত তুলে ধরে বলেন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রই ইসলামী সন্ত্রাসবাদের ধারণা ছড়িয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, টুইন টাওয়ারে হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী ইসলামী সন্ত্রাসবাদের ধারণা ছড়িয়েছে, কিন্তু আমি এই ধারণার ঘোর বিরোধী। ইসলাম একটি প্রাচীন ধর্ম এবং সারাবিশ্বে এর কোটি কোটি সমর্থক অনুসারী রয়েছে উল্লেখ করে প্রণব মুখার্জী বলেন, ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের তুলনা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[১৫৯]

জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিণতি

জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলাফল হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়। আমরা এখানে ইসলামের নামে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কিছু ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করব।-

১. শক্তিশালী অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক দেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও আগ্রাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়।

২. ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্ত হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মের অনুপম আদর্শও মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। এমনকি ইসলাম মানুষের কাছে এক অপ্রিয় দ্বীন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

৩. প্রকৃত ইসলামী জাগরণ ও ইসলামের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. ইসলাম শিক্ষার কেন্দ্র তথা বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

---

১৫৮. ***দৈনিক আমার দেশ,*** ২ জুন ২০০৮ খৃঃ, সোমবার, পৃঃ ১৬ ও ২, কলাম ৮ ও ৬, ।
১৫৯. ***দৈনিক ইনকিলাব,*** ১৭ জুন ২০০৮, মঙ্গলবার, পৃঃ ১, কলাম ৬-৮।

৫. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ত্রুটিযুক্ত ধারণা করা হয় এবং ইসলামকে দোষারোপ করা হয়। এর ফলে ইসলামী শিক্ষা থেকে মানুষ দূরে সরে যায়।

৬. ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি তাদের অপতৎপরতা নির্বিঘ্নে চালানোর সুযোগ লাভ করে।

৭. ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রম পরিচালনায়ও আলেম-ওলামা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। যার ফলে সমাজে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও গর্হিত কাজ প্রসার লাভ করে। সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়।

৮. মুসলিম জনগণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা ও পারস্পরিক হিংসা, হানাহানি সৃষ্টি হয়, দূরীভূত হয় পারস্পরিক সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্ব। বিনষ্ট হয় সামাজিক সুদৃঢ় বন্ধন।

৯. ইসলাম বিদ্বেষী প্রচার মাধ্যমগুলো দ্বীন ইসলাম, ইসলামের জিহাদ ও ইসলামী শরী'আতের সেবামূলক ও কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডকেও বিকৃত করে জাতির সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়।

১০. দেশে দ্বন্দ্ব-কলহ ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দারুণভাবে বিনষ্ট হয়। দেশে বিরাজ করে এক অস্থিতিশীল ও ভীতিকর পরিবেশ।

১১. জিহাদের নামে পরিচালিত নাশকতামূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলামী জিহাদের অনাবিল বৈশিষ্ট্যকে কলুষিত করে এবং একে মানুষের নিকটে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।[১৬০]

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

১. গোঁড়ামি ও চরমপন্থা : প্রেক্ষিত ইসলাম

২. ধর্মে বাড়াবাড়ি

প্রাপ্তিস্থান

◊ **মাসিক আত-তাহরীক,** নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন: ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

◊ **শ্যামলবাংলা প্রকাশনী,** নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবা: ০১৭১১-৪৮১৯৭০।

১৬০. *বারাআতুল ইসলাম মিন কাতলিল আরাবিয়া,* পৃঃ ৭-৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জঙ্গীবাদ

বাংলাদেশের চরমপন্থী দল সমূহ

বাংলাদেশের চরমপন্থী দলগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ধর্মভিত্তিক ও ধর্মহীন। ধর্মভিত্তিক চরমপন্থী দলগুলো বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতন-নিপীড়নকে প্রতিহত করার জন্য গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা জিহাদের অপব্যাখ্যা করে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। নিম্নে চরমপন্থীদের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।-

হরকাতুল জিহাদ : ১৯৮৬ সালে আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী' (হুজি)-এর জন্ম হয়। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেখান থেকে ফিরে এসে বাংলাদেশী মুজাহিদরা ১৯৮৯ সালে এ দেশে হুজির কার্যক্রম শুরু করে। শুরুর দিকে তাদের লক্ষ ছিল মিয়ানমারের মুসলিম অধ্যুষিত আরাকানকে স্বাধীন করা। এ উদ্দেশ্যে হুজির কেন্দ্রীয় নেতাদের অধিকাংশই কক্সবাজার-মিয়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্য থেকে সদস্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান সহ আরাকানীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৬ সালে কক্সবাজারের লণ্ডাখালী জঙ্গলে সশস্ত্র প্রশিক্ষণকালে হুজির ৪০ জন সদস্য গ্রেফতার হয়েছিল।

১৯৯২ সালের ১ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী' (হুজি)'র। এরপর দেশে বিভিন্ন ধরনের নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর ফলে ২০০৫ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার হুজিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০০২ সালের ২১ মে বাংলাদেশের হরকাতুল জিহাদকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে তালিকাভুক্ত করে। সর্বশেষ ২০০৮ সালের ৫ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস এক নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশের হুজিকে একটি 'বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন' এবং একটি 'বিশেষভাবে চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী' হিসাবে ঘোষণা দেন।[১৬১]

জামাআতুল মাজাহিদীন বাংলাদেশ : জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জএমবি) গঠনের নির্দিষ্ট তারিখ অজ্ঞাত। তবে ১৯৯৮ সালে জেএমবি'র মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং এর আমীর নিযুক্ত হন শায়খ আবদুর রহমান। এরপর তারা কর্মী তৈরীর উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। শূরা সদস্যরা দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে নিজেদের আসল নাম পরিবর্তন করে সাংগঠনিক ছদ্মনামে বাসা ভাড়া নিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করে। জেলার বিভিন্ন থানায় তারা সফর শুরু করে প্রেরণা, ধর্মীয় আলোচনা, বক্তৃতা ও দাওয়াতের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ বা রিক্রুটিংয়ের কাজ

১৬১. ***প্রথম আলো,*** ২১ আগষ্ট '০৮, পৃঃ ৩, কলাম ৪; ঐ, ২১ জুলাই, '০৮, পৃঃ ১ ও ১৭।

চালাতে থাকে। এক জেলায় কর্মী সংগ্রহ আশানুরূপ হলে শূরা সদস্যরা অন্য জেলায় গমন করত। এভাবে সব জেলাতে কিছু কিছু কর্মী তৈরী হলে তাদেরকে একত্রিত করে দেশের বিভিন্ন মসজিদে তাবলীগবেশে তালীম দেয়া হয়। তালীম শেষে সদস্যদেরকে ইউনিট, থানা ও জেলা সংগঠন অনুযায়ী বিভক্ত করে দায়িত্ব দেয়া হয়।[১৬২]

উল্লেখ্য, জেএমবি অভিযানকালে 'মুজাহিদ', 'মুসলিম রক্ষা মুজাহিদ ঐক্য পরিষদ' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' এ তিনটি নাম ধারণ করত।[১৬৩]

ধর্মহীন চরমপন্থী দল সমূহ :

এসব চরমপন্থী দলের উত্থান নিয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। মূলধারা থেকে সরে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে ওঠে ১০টি চরমপন্থী দল। এসব চরমপন্থীরা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠলেও কেবল ঐ অঞ্চলেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সারা দেশে তারা তৎপরতা চালায়। ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের মানুষের কাছে এক সময় তারা পেশাদার অপরাধী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হত্যার মাধ্যমে অস্ত্রলুট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে নিহত হওয়া এবং নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটেছে বিগত বছরগুলোতে। দলগুলো নিম্নরূপ-

দেশে বিদ্যমান ১০টি চরমপন্থী দল হচ্ছে- (১) পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি (এম.এল. জনযুদ্ধ), (২) পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল. লাল পতাকা), (৩) জাসদ গণবাহিনী, (৪) শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, (৫) বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, (৬) সর্বহারা, (৭) সর্বহারা মাদারীপুর, (৮) নিউ লাল পতাকা (নবগঠিত), (৯) সর্বহারা কামরুল গ্রুপ (বরিশাল), (১০) সর্বহারা জিয়া গ্রুপ (বরিশাল)।[১৬৪]

বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কিছু চিত্র

বাংলাদেশে বোমা হামলা শুরু হয় ১৯৯১-১৯৯৬ সালে। এসময় বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা হলেও হতাহতের ঘটনা ছিল কম। কিন্তু ১৯৯৬-২০০১ সালে বোমা হামলায় হতাহতের অনেক ঘটনা ঘটে।[১৬৫] এসময়ে বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটার একটি কারণ এই হতে পারে যে, ১৯৯৮ সালে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ'

---

১৬২. মেহেদী হাসান পলাশ, ***জঙ্গীবাদ : টার্গেট কেন বাংলাদেশ*** (ঢাকা: বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, ২০০৬), পৃঃ ২৭।
১৬৩. ***ঐ***, পৃঃ ৪১।
১৬৪. ***দৈনিক ইনকিলাব***, ১৯ জুন ২০০৮, পৃঃ ১, ১ম কলাম।
১৬৫. প্রফেসর এম হাবিবুল আহসান, বোমা হামলা ও আমাদের রাজনীতি, ***আমার দেশ***, ১৩ মার্চ, ২০০৫, পৃঃ ৭।

(জেএমবি) আত্মপ্রকাশ করে[১৬৬] এবং তাদের প্রশিক্ষিত ক্যাডার দিয়ে বোমা হামলা চালাতে থাকে। এরা ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার বড়কান্দি গ্রামে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় হামলা চালায়। তাদের ব্রাশ ফায়ারে জাসদের অন্যতম শীর্ষনেতা মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক কাজি আরিফ সহ ৫ জন নিহত এবং আহত হয় আরো ২০ জন লোক।[১৬৭] এর মাত্র ১৯ দিন পরে ৬ মার্চ'৯৯ রাত ১টা ১০ মিনিটে যশোরে অনুষ্ঠিত উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক শক্তিশালী বোমা হামলা চালায়। এতে শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী সহ ১০ জন নিহত এবং আহত হয় অর্ধশতাধিক লোক।[১৬৮] এরপর ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল মোতাবেক ১৪০৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ শনিবার সকাল ৮টা ৫মিনিটে রমনার বটমূলে জঙ্গীরা বোমা হামলা চালায়। এতে ১০ জন নিহত এবং আহত হয় ৩০ জন লোক।[১৬৯] এর অল্প কিছুদিন পরে ২০০১ সালের ৩ জুন রবিবার সকালে গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর উপজেলার বানিয়ারচর গ্রামের একটি ক্যাথলিক গীর্জায় সন্ত্রাসীরা এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ১০ জন নিহত ও ২৬ জন আহত হয়।[১৭০] ২০০২ সালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির জনসভায় বোমা হামলা হয়। একই বছরের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ৪টি সিনেমা হলে একযোগে বোমা হামলা হয়। এতে ১৯ জন লোক নিহত এবং ৫০ জনের অধিক আহত হয়। এরপর ২০০৪ সালের ৭ মে টঙ্গীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহসানুল্লাহ মাষ্টার (এমপি) নিহত ও অনেকে আহত হয়। ঐ বছরের ২১ আগষ্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জনসভায় সন্ত্রাসীরা গ্রেনেড হামলা চালায়। এতে আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমান সহ বহু লোক হতাহত হয়। ২০০৫ সালের ২৮ জানুয়ারী হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষনেতা সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়া সহ ৭ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। পরবর্তীতে একের পর এক সিনেমা হল ও যাত্রা প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা হতে থাকে। এছাড়া গোপালগঞ্জ ও নওগাঁ সহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ব্র্যাক অফিসে হামলা চালায় জঙ্গী-সন্ত্রাসীরা। ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৯ বছরে সংঘটিত ৩০ টি বোমা হামলার তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ায়[১৭১] এবং জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় তারা সুযোগ পেয়ে যায়। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০০৫ সালের ১৭ আগষ্ট দেশের ৬৪ জেলার ৬৩ জেলায় প্রায় ৫ শতাধিক স্থানে একযোগে বোমা হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা

---

১৬৬. ***দৈনিক যুগান্তর,*** ১১ মার্চ ২০০৫, পৃঃ ১৯।
১৬৭. ***মাসিক আত-তাহরীক*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), মার্চ ১৯৯৯, পৃঃ ৩৩।
১৬৮. ***তদেব,*** এপ্রিল ১৯৯৯, পৃঃ ৪৮।
১৬৯. ***তদেব,*** মে ২০০১, পৃঃ ৩৯।
১৭০. ***তদেব,*** জুলাই, ২০০১, পৃঃ ৩৮।
১৭১. ***দৈনিক নয়াদিগন্ত,*** ১৮ মার্চ ২০০৫, পৃঃ ৮।

এ সিরিজ বোমা হামলা চালিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি। এরপরে তারা ৩রা অক্টোবর'০৫ বিভিন্ন আদালতে এবং ১৪ নভেম্বর'০৫ ঝালকাঠি, ১৮ নভেম্বর'০৫ গাজীপুর ও ২৯ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে বিচারক সহ বহু নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এসব বোমা হামলায় ৩৩ জন লোক নিহত এবং আহত হয় দুই শতাধিক।[১৭২] ঐ বছরের ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোনায় ৩০ মিনিটের ব্যবধানে দু'টি বোমা হামলা হয়। এতে ১০ জন লোক নিহত হয়।[১৭৩]

বাংলাদেশে বোমা হামলার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা সাম্রাজ্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি তাদের দোসরদের মাধ্যমে ঘটিয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মত ব্যক্ত করেছেন। এদেশের অল্প বয়সী ও স্বল্প শিক্ষিত কিছু তরুণকে জিহাদের নামে পরকালে জান্নাত লাভের প্রলোভনে উজ্জীবিত করে তাদেরকে ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে। তারা যে অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে একথা অনুধাবনের মত জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য কোনটাই তাদের নেই। তাই ষড়যন্ত্রকারীদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে এরা শাহাদতের তামান্নায় ব্যাকুল হয়েছে। 'জন্মই আজন্ম পাপ' ভেবে মৃত্যুর আনন্দ স্পর্শ করতেই তারা অস্থির হয়ে পড়েছে। অল্প বয়সের এসব তরুণ-যুবকরা প্রকৃত অভিভাবকের অভাবে, অভিভাবকদের যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাবে কিংবা তাদের উদাসীনতায় ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো, সুবিধাবঞ্চিত, অভিভাবকহীন যুবক-তরুণরা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লিপ্ত হয় ধ্বংসযজ্ঞে, ঘটায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। জীবনের প্রতি যেহেতু তাদের কোন মায়া-মমতা থাকে না, তাই তারা সহজেই আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। আর স্বার্থান্বেষী মহল এই শ্রেণীর লোকদেরকেই কাজে লাগিয়েছে। এসব সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনার নেপথ্যে মতলববাজদের রয়েছে কতিপয় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও কিছু হীন উদ্দেশ্য। এখানে আমরা কিছু মৌলিক উদ্দেশ্য উল্লেখ করব।

১. দেশকে ব্যর্থ, অকার্যকর ও বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত করা :

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অভ্যন্তরে আছে তেল, গ্যাস, কয়লার মত মূল্যবান খনিজ সম্পদ। উপরে আছে রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাকশিল্প, সাদা সোনা খ্যাত চিংড়ি মাছ, আছে পাট, চা, তামাকের মত অর্থকরী ফসল। দেশের এ অমিত সম্ভাবনাময় খাত দেখে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যখন

১৭২. *দৈনিক ইনকিলাব,* ৩০ মার্চ ২০০৭, পৃঃ ৭।
১৭৩. ফোরকান আলী, সন্ত্রাসবাদ : ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার, *দৈনিক ইনকিলাব,* ২৫ জুন ২০০৭, পৃঃ ১৪।

এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহী হয়েছে, ক্রমোন্নয়নশীল এদেশের সহযোগিতায় যখন বিভিন্ন দেশ এগিয়ে এসেছে, তখন এদেশটিকে ব্যর্থ, অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য একটি মহল এদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে। আর এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে দেশটিকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে একে বন্ধুহীন করে দেয়াই ঐ মহলের উদ্দেশ্য।

২. দেশকে একটি মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করা :

কোন দেশকে করতলগত করতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নতুন কৌশল হচ্ছে সে দেশকে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করা। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এ মুসলিম রাষ্ট্রকে দখল করে এর সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের দোসরদেরকে ইসলামের লেবাসে সজ্জিত করে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। যাতে সহজেই এদেশটিকে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করে একে করায়ত্ব করা যায়।

৩. দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে একে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত করা :

বাংলাদেশে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ থাকার কারণে এখানে ব্যবসার বাজার সৃষ্টির অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের বিশাল জনসম্পদের কারণে শ্রমের মূল্য এখানে কম, দেশে-বিদেশে এখানকার বিভিন্ন শিল্প সুনাম কুড়িয়ে বিদেশী বিনিয়োগ যখন আকৃষ্ট করছে, তখনই ঘটেছে বর্বরতম ও জঘন্যতম বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। যাতে দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে অশান্ত করে দিয়ে বিদেশী বিনিয়োগকে প্রতিহত করা যায় এবং দেশটি যাতে স্বনির্ভর দেশ হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। এর পাশাপাশি দেশের রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্প সেক্টর গার্মেন্টসগুলোতেও পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে এখাতকেও গলা টিপে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এভাবে দেশের বিভিন্ন শিল্পকে ধ্বংস করে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিয়ে দেশটিকে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে একটি মহল অতি সুকৌশলে। আর তারা তাদের এদেশীয় দোসরদের ব্যবহার করে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে বোদ্ধা মহল মনে করেন।

৪. দেশের মুসলিম জনগণ ও ইসলামকে কলুষিত করা :

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ নাগরিক মুসলিম। মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ হলেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ধর্মকর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বাংলাদেশ

ইতিমধ্যেই বিশ্বে 'মডারেট মুসলিম' দেশ হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সে দৃষ্টান্তের উপর কালিমা লেপন করে আমাদের সকল অর্জন ও অগ্রযাত্রাকে রুখে দিয়ে দেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বিপজ্জনক রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণ করার দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য সন্ত্রাসী তৎপরতার নেপথ্য কুশলী ও নায়করা কাজ করছে। আর তাদের এই ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করছে, অন্যদিকে তেমনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, অশিক্ষিত কোমলমতি তরুণ-যুবকদের ভুল বুঝিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কাজে লাগাচ্ছে। এর ফলে একদিকে ইসলাম ও বিশ্ব মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে, অন্যদিকে এদেশের মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা খর্ব হচ্ছে, তাদের নন্দিত পরিচয় বিশ্ব দরবারে নিন্দিত হচ্ছে, কলুষিত হচ্ছে জাতিসত্তা।

উক্ত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে জড়িতরা নামে মুসলমান হলেও মূলতঃ তারা ইসলাম ও বিশ্ব মুসলিমের সুহৃদ নয়, নয় এ দেশের জনগণের কল্যাণকামী। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী 'ক্রুসেড' চলছে। পাশাপাশি ইসলামকে সহিংস-সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে, চলছে মুসলমানদেরকে বিশ্ব দরবারে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী জাতি হিসাবে উপস্থাপনের জোর অপতৎপরতা। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ও এদেশের মুসলিম জনগণ ঐ অপপ্রচারের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ মৌলবাদী দেশ, এখানে মৌলবাদী, জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের উত্থান ঘটেছে এই অপপ্রচারকে একটি যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতেই বোমাহামলা চালানো হয়েছে। আর এর মাধ্যমে বহিরাগত আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের পথ সুগম হচ্ছে। যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে আফগানিস্তান ও ইরাকের ভাগ্য বরণ করা।

৫. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা :

বাংলাদেশ মধ্যপন্থী মুসলমানদের একটি দেশ। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এদেশকেই প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অপরদিকে এদেশের মুসলমানদের অকৃত্রিম উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও দেশটি দ্রুত অগ্রসরমান। উন্নয়ন সূচকের অনেক ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান অনেক দেশের নিকট ঈর্ষণীয়। এ অবস্থায় একটি বিশেষ মহল দেশে অস্থিতিশীলতা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে এবং এর উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

৬. মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে প্রেক্ষাপট তৈরী করা :

ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত ও প্রতিহত করতে ইসলামের শত্রুরা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আর এভাবেই পৃথিবীতে যুগে যুগে ইসলামের বিজয়াভিযানের পথ রুদ্ধ হয়েছে, সূচিত হয়েছে ইসলামের দুঃখজনক পরাজয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে, দেশের চলমান ঘুষ, দুর্নীতি, ধর্ষণ-অপহরণ, অস্থিরতা সহ বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে এদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ যখন ইসলামী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে নেয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, তখন ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে ইসলামের সৌম্য-শান্তিপূর্ণ সনাতন রূপকে বিকৃত করে জনগণের সামনে তুলে ধরে মানুষকে ইসলামের অনুপম আদর্শ থেকে ফিরিয়ে আনতে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে এই সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। ইসলাম বৈরী শক্তি তাদের এই মিশনকে সফল করতে মুসলমানদের মধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ করেছে, যারা লেবাসে-পোশাকে এবং বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণে মুসলিম সেজে মুসলিম সমাজে মিশে গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। যুগে যুগে এসব মুনাফিকদের দ্বারাই ইসলাম ও মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

একথা কারো অজানা নয় যে, বিশ্বঅর্থনীতি আজ পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। মুসলিম দেশগুলোতে তারা সুকৌশলে তাদের দোসর বা তাবেদারদের বসিয়ে রেখেছে। যারা পুঁজিবাদী প্রভুদের আজ্ঞাবহ দাস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাদের স্বার্থকেই সংরক্ষণ করছে। যেখানে মুসলমানদের উত্থান বা জাগরণ পরিলক্ষিত হয় কিংবা পুঁজিবাদীদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হয়, সেখানেই মুসলমানদের উপর অতি কৌশলে ও সুপরিকল্পিতভাবে নেমে আসে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন। তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে কিংবা মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে বা অবাস্তব অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাছিলে সচেষ্ট হয়। কখনো তারা কোন দেশের মানুষকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী হিসাবে তুলে ধরে, দেশে দেশে বোমা হামলা চালিয়ে কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তা মুসলমানদের নামে চালিয়ে দেয়। এসব হামলার সাথে সাথে তাদের উচ্ছিষ্টভোজী তাদের দোসররা জিগির তোলে যে, ইসলামপন্থী মৌলবাদীরা এ হামলা চালিয়েছে। এরপর তদন্তের নামে কিছু দিন বাহানা চলে। আর সব দোষ চাপানো হয় মুসলমানদের কাঁধে। এসকল অপকৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদের মৌলবাদী, জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে

সচেষ্ট হয়। কখনো যেন তেন প্রকারের অজুহাত তুলে ধরে দেশে ঢুকে পড়ে দেশ দখল করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে, দেশের জনগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়, নির্বিচারে হত্যা করে নিরপরাধ মানুষকে। অথচ এসব অপকর্ম নেপথ্য নায়করা পর্দার আড়ালে বসে অপকর্ম করে বলে তারা পর্দার অন্তরালেই থেকে যায়। তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার দুঃসাহস কেউ দেখায় না। এভাবে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড মুসলমানদের নামে চালিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার প্রেক্ষাপট তৈরী করাই পুঁজিবাদীদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৭. দেশের আইন সংশোধন করা :

দেশে বর্তমানে প্রচলিত আইন সংশোধন করে সন্ত্রাস বিরোধী নতুন আইন প্রবর্তনের নামে নব্য স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা এবং জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা সন্ত্রাসী হামলার মূল হোতাদের উদ্দেশ্য। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রকে এমন এক পর্যায়ে উপনীত করা যাতে বিরোধী দল-মত দমনে রাষ্ট্র এক নগ্ন হাতিয়ারে পরিণত হয়। আর এর মাধ্যমে আইনের দোহাই দিয়ে তাদের উপর যথেচ্ছা নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো যায়।

৮. দেশ দখল কিংবা ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করা :

দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়ে ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্য শক্তি তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে এদেশ শাসন করে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর। দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও দেশের শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করার লক্ষ্যে দেশকে অশান্ত করে তোলা। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে ইরাক ও আফগানিস্তানের মত এদেশ দখল করা। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছরের বৃটিশ শাসনের মত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পুনরায় ইহুদী-খৃষ্টানদের শাসন কায়েম করা।

৯. মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখা :

ইসলামের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা এবং ইসলামী লেবাস-পোশাক ও সংস্কৃতি অনুকরণের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা। এটা ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আগ্রাসনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ। আর ঐ তৎপরতা আমাদের জাতিকে প্রধানত রাষ্ট্রকে ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে সহায়তা করবে।

মোটকথা ৯০ দশকে কমিউনিজম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্তির পর পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামকে একমাত্র চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করছে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে ইসলামকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করার জন্য

সারা বিশ্বে মুসলমানদেরকে কাজে লাগিয়েছে। এদেশে সংঘটিত বোমা হামলার সাথে জড়িতদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। তাদেরকে অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলাম ধর্মের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে, শাহাদতের তামান্নায় উজ্জীবিত করে এবং জান্নাত লাভের বাসনায় অনুপ্রাণিত করে সন্ত্রাসী কাজ করানো হয়েছে। এধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িতরা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, দেশ ও জাতির দুশমন।

বোমা হামলায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ও লাভবান হচ্ছে কারা

বোমা হামলায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকার, ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদ, ইসলামী সংগঠন, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও দেশের অর্থনীতি। আর এতে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি, থমকে যাচ্ছে দেশের সার্বিক অগ্রগতি। সর্বোপরি দেশের মুসলিম জনগণ ও ইসলাম ধর্ম হচ্ছে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এমনকি এ বোমা হামলাকে পুঁজি করেই মুসলিম জাতিসত্তাকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একটি মহল।

বোমা হামলা দ্বারা কারা সুবিধা নিচ্ছে, কারা এর ফায়দা লুটছে তা আজ সকলের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট। পৃথিবীতে যারা ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারা ভাল করেই জানে যে, বোমা হামলা দ্বারা, সন্ত্রাসী তৎপরতা দ্বারা মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করা যায় না, মানুষকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা যায় না; বরং মানুষ দূরে সরে যায়, ইসলামের নামে তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে কাজে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়, ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরী হয়, কোন ইসলামী দলের পক্ষে সেরকম কোন কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একের পর এক বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে। কৌশলে এসবের তদন্তগুলো আড়াল করা হচ্ছে। আর প্রচার মাধ্যমগুলোতে মৌলবাদীর জিগির তোলা হচ্ছে। এটা মূলতঃ মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরানো, ইসলামী আন্দোলন বিমুখ করা এবং ইসলামকে ধ্বংস করার একটা অপকৌশল। আর এ বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দ্বারা ইসলামের শত্রুরাই সুবিধা ভোগ করছে, তারাই অধিক লাভবান হচ্ছে।

জঙ্গীবাদের সাথে কওমী মাদরাসার সম্পৃক্ততা :

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ সৃষ্টির পিছনে কওমী মাদরাসাকে ঢালাওভাবে দায়ী করতে চেষ্টা করেন এদেশের কোন কোন বুদ্ধিজীবী। এজন্য এ প্রসঙ্গে কিছু বলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করি।

কওমী মাদরাসার জঙ্গী কানেকশন প্রসঙ্গটি একটু খতিয়ে দেখা দরকার। কওমী মাদরাসাগুলোতে মূলতঃ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে ধর্মচর্চা তথা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মানবজাতির সার্বিক মনমানসিকতা মানবীয় সৎগুণাবলীর দিকে ধাবিত করার শিক্ষাই দেওয়া হয়। ফলে কওমী মাদরাসা শিক্ষিত কোন ছেলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ, অপহরণের মত অপকর্মে লিপ্ত হয় না। লিপ্ত হয় না দোকান-পাট, কল-কারখানা, গাড়ী-ঘোড়া ভাংচুর বা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেশ ও জাতির মূল্যবান সম্পদ বিনষ্টের ধ্বংসাত্মক কোন কর্মকাণ্ডে। তেমনি এদেশে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা ভাংচুরের যে ঘটনা ঘটে, সেসবে কওমী মাদরাসার ছাত্রদের জড়িত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরই এসবে জড়িত থাকার হাজারো প্রমাণ মেলে।

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, কওমী মাদরাসগুলো সর্বদা ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করে আসছে। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাথে এদের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলা ভার। বরং সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত খেলা ভারত উপমহাদেশে শুরু করেছে ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিক লোকেরা। তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নানা কৌশলে এখনো এ খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মুসলমানদের আগমনের সময় থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েমের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছরে এ অঞ্চলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু একটাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। এ অঞ্চলের সব ধর্মের মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কাকে বলে তা তারা বুঝতই না। অথচ সে সময়ে মুসলমানদের শিক্ষার একমাত্র উপায় ছিল মাদরাসা। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক হয়ে এ অঞ্চলের মানুষ বুঝতে শিখেছে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্মের সম্মান বাড়ে (!) সে সাথে অন্যান্য লাভেরও সম্ভাবনা থাকে।[১৭৪]

কওমী মাদরাসাগুলোর মধ্যে যারা জেএমবি কানেকশন খোঁজার চেষ্টা করেন, তাদের জানা উচিত যে, এসব মাদরাসায় ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি অন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শিখানো হয় তা হচ্ছে নম্রতা-ভদ্রতা, শালীনতা-শিষ্টাচার। এ কারণে বর্তমান অবক্ষয়ের যুগেও কওমী মাদরাসার ছাত্রদের বখাটেপনার কোন দৃষ্টান্ত নেই। কওমী মাদরাসার চরম বিরোধীরাও একথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এ মাদরাসাগুলো অত্যন্ত নিয়ম-শৃংখলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং এসব মাদরাসার কোন ছাত্রের পক্ষে জঙ্গী হয়ে ওঠা অসম্ভব।

১৭৪. সঞ্জীব চৌধুরী, জঙ্গিপনার পোস্টমর্টেম : কওমী মাদ্রাসা, ***দৈনিক আমার দেশ,*** ১ আগস্ট, ২০০৬, পৃঃ ৬।

কওমী মাদরাসার ছাত্ররা সৎপথে হালাল জীবিকা উপার্জনের ও অল্পে তুষ্ট থাকার শিক্ষা পেয়ে থাকে। অবৈধ পথে অর্থোপার্জন, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ও সুদ-ঘুষ ইত্যাদিকে তারা হারাম জানে। তাই এসব মাদরাসার শিক্ষার্থীরা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে সৎপথে অটল থেকে আদর্শের সংগ্রাম করে যায়। ফলে তারা সরকারী সম্পদ চুরি করে সম্পদের পাহাড় গড়ার স্বপ্ন দেখে না, অন্যের সাথে প্রতারণা করে, জনগণকে ফাঁকি দিয়ে শিল্পপতি বনে যাওয়ার কল্পনাও করে না কিংবা দেশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মত চাঁদাবাজি ও লুটতরাজ করে 'স্বর্ণকমল' গড়ে তোলার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয় না।

এখানে আরো একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দেশে জঙ্গীদের জনবল ও কওমী মাদরাসার ছাত্রসংখ্যার মধ্যে তুলনা করলে কওমী মাদরাসার সাথে জঙ্গী কানেকশন আছে কি-না তা আরো স্পষ্ট হবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। আমরা জানি, দেশের শীর্ষস্থানীয় কওমী মাদরাসা যেমন হাটহাজারী, পটিয়া, লালবাগ, বড়কাটরা, উত্তর যাত্রাবাড়ী, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ছারছিনা, গহরডাঙ্গা প্রভৃতি মাদরাসায় হাজার হাজার ছাত্র লেখা পড়া করে। এরা যদি জঙ্গী তৎপরতায় জড়িত থাকত, তাহলে দেশে জঙ্গীদের সংখ্যা হতো কয়েক লাখ। কিন্তু বাস্তবে আমরা যা দেখি তা হচ্ছে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সুতরাং কওমী মাদরাসার সাথে জঙ্গী কানেকশন খোঁজা হাস্যকর বৈকি?[১৭৫]

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের উপর পরিচালিত দু'টি জরিপ রিপোর্ট আমরা এখানে উপস্থাপন করব।

(১) দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকের সহকারী সম্পাদক জনাব মেহেদী হাসান পলাশ একটি গবেষণামূলক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন। তিনি গত ১০ মার্চ ঢাকা মহানগরীর 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ' (বিস) মিলনায়তনে 'সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ' (সিএসপিএস) আয়োজিত 'টেরোরিজম ইন টুয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরী : বাংলাদেশী পারসপেকটিভ' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে আলোচিত জঙ্গীবাদ উত্থানের কয়েকটি কারণ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সেমিনারের কয়েকজন আলোচক বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থানকে স্থানীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ জেএমবি অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ বেশিরভাগ পেয়েছে বিদেশ থেকে। তিনি আরো বলেন, কেউ কেউ জঙ্গীবাদের জন্য অশিক্ষা, বেকারত্ব, মাদরাসা শিক্ষাকে জোরালোভাবে দায়ী

---

১৭৫. *তদেব।*

করেছেন। কেউ কেউ আবার সরাসরি ইসলামকে এবং আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়া এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করাকে দায়ী করেছেন।[১৭৬]

এ প্রসঙ্গে জনাব হাসান তাঁর অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। র‍্যাব কর্তৃক জব্দকৃত জেএমবি'র বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেএমবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কেন্দ্রীয় রিপোর্টে জেএমবির মোট সদস্য সংখ্যা ৬,৭৩৯ জন উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জেএমবি'র প্রতি সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা ৪,২৫০ জন। জেএমবি'র ভাষায় তাদেরকে সুধী বলা হয়। এই ৬,৭৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৭৬% বা ৫,০৯১ জন প্রশিক্ষণবিহীন বা তালিম ছাড়া কর্মী। বাকী ২৪% বা ১,৬৪৮ জন প্রশিক্ষিত কর্মী। এই ১,৬৪৮ জন প্রশিক্ষিত কর্মীর মধ্যে আবার ১৬৯ জন অর্থাৎ ১০% এহসার বা পূর্ণকালীন সদস্য, মোটামুটি ২% বা ৪০ জন জোন বা জেলা দায়িত্বশীল এবং ৭ জন শূরা সদস্য। এই প্রশিক্ষণের আবার বেশির ভাগই দাওয়াতী তালিম। অস্ত্র প্রশিক্ষণ ছিল শুধু পূর্ণকালীন সদস্যদের অর্থাৎ সর্বমোট সদস্যের মাত্র ৩.২%। আর ২১৬ জন নিয়ে গঠিত জেএমবি'র হার্ড কোর গ্রুপ। লজিস্টিক সাপোর্টের মধ্যে ছিল ১২টি মোটর সাইকেল, ৯৬টি সাইকেল, ৪টি কম্পিউটার, ৪১টি মোবাইল, ১টি ফ্রিজ ও ৪টি জেনারেটর।[১৭৭]

সেমিনারে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নিরক্ষরতা এবং মাদরাসা শিক্ষাকে জঙ্গীবাদ উত্থানের বড় কারণ বলে চিহ্নিত করেন জোরালোভাবে। কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। জেএমবি'র গ্রেফতারকৃত ৭২০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৭% অশিক্ষিত বা নিরক্ষর এবং ৯৩% সদস্য শিক্ষিত। এই ৯৩% শিক্ষিত জেএমবি সদস্যদের মধ্যে আবার ৫৩% সাধারণ শিক্ষায় এবং ৪০% মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে না যে, জঙ্গীবাদ উত্থানে মাদরাসা শিক্ষা দায়ী। পেশাগতভাবেও জেএমবি সদস্যদের মধ্যে মাত্র ১৯% ইমাম, মুয়াযযিন ও মাদরাসা শিক্ষক, যা অন্যান্য অনেক পেশার চেয়ে কম। আবার মাদরাসা শিক্ষিত জেএমবি সদস্যের মধ্যে ৭৩% এসেছে আলিয়া ধারা থেকে, কওমী ধারা থেকে এসেছে ১৫% এবং হাফেযী ধারা থেকে এসেছে মাত্র ১২%। অর্থাৎ যারা কওমী মাদরাসাকে জঙ্গীবাদের কোকুন বা আতুঁরঘর বলে দাবী করে থাকেন, তারা যে বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন, এ পরিসংখ্যান থেকে তা সহজেই অনুমিত হয়।[১৭৮]

(২) এ প্রসঙ্গে আরেকটি জাতীয় পত্রিকার রিপোর্ট হচ্ছে- বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতারকৃত জেএমবি নেতা-কর্মীদের ৫০৬ জনের উপর পরিচালিত এক জরিপে এমন কিছু তথ্য

১৭৬. *দৈনিক ইনকিলাব,* ১১ মার্চ ২০০৭, পৃঃ ১।
১৭৭. *তদেব।*
১৭৮. *তদেব।*

বেরিয়ে এসেছে, যা এই জঙ্গী সংগঠনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জনমনে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলো বদলে দিতে পারে। বিভিন্ন মামলায় আটককৃত ৭০১ আসামীর মধ্যে প্রায় তিন মাস ধরে চালানো এ জরিপে ৫০৬ জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পুলিশের একটি বিভাগ এ রিপোর্টটি তৈরী করেছে।[১৭৯]

জেএমবির সশস্ত্র অভিযানের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এরা কওমী মাদরাসা শিক্ষিত। কিন্তু বাস্তব তার সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের মধ্যে শতকরা ৬৫.২১ ভাগ মূলধারার ইহজাগতিক বা সেকিউলার শিক্ষায় শিক্ষিত। এর মধ্যে ৩৬.৭৫ শতাংশ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পার করেছে ১৯.১৬ শতাংশ এবং ৯.২৮ শতাংশ স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই জঙ্গীদের ৩৪ শতাংশ মাদারাসা শিক্ষিত। এদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩.৭৫ ভাগ কওমী মাদরাসায় পড়েছে।[১৮০]

উল্লিখিত রিপোর্টের আলোকে বলা যায় যে, যাচাই-বাছাই না করে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কওমী মাদরাসা শিক্ষিতদের উপর জঙ্গীবাদের দোষ চাঁপানো জ্ঞানীদের কাজ নয়। কেননা যেখানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংখ্যাই বেশি, সেখানে তাদের কথা না বলে সকল দোষ কওমী মারাসার উপরে চাঁপানো হিংসাত্মক মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং কারো প্রতি বাঁকা দৃষ্টিতে না তাকিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করাই বাঞ্ছনীয়।

আহলেহাদীছদেরকে অভিযুক্ত করা :

জঙ্গী নেতারা কোন আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান হওয়ায় ঐ গোটা কমিউনিটির প্রতি জঙ্গীবাদের অভিযোগ আরোপ করারও চেষ্টা করেন অনেকে। এটা অনুচিত ও অবাঞ্ছিত। কেননা কিছু এমপি-মন্ত্রীদের দুর্নীতির কারণে দেশের সকল এমপি-মন্ত্রী তথা রাজনীতিবিদদের যেমন দুর্নীতিবাজ বলা যায় না, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কারো চৌর্যবৃত্তির কারণে যেমন আধুনিক শিক্ষিতদের সবাইকে ঐ দোষে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুফতী হান্নান, কাওছার গংদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের সন্ত্রাসী বলা যেমন সমীচীন নয়, তেমনি আবদুর রহমান, বাংলাভাই আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান হওয়ার কারণে তাদের অপরাধের দায় সমস্ত আহলেহাদীছ জনগণের উপরে চাপানো বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়। আহলেহাদীছরা এদেশের নাগরিক। তারা এদেশে উদ্বাস্তু নয় কিংবা রোহিঙ্গাদের মত উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। বরং এদেশ তাদের জন্মভূমি-মাতৃভূমি,

১৭৯. *দৈনিক যায়যায় দিন*, ২৬ আগষ্ট, ২০০৬ খৃঃ, পৃঃ ১।
১৮০. *তদেব*।

এদেশের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে তাদের হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদের অবদানও কম নয়। **১৯৭১** সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারাও অন্যান্য নাগরিকদের মত যুদ্ধ করেছে। হাজী শরীয়তুল্লাহ, নেছার আলী তিতুমীর, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শীর মত বহু মনীষী এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে, শিক্ষা-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন রক্ষায় ও সমৃদ্ধকরণে অবদান রেখে গেছেন। অতএব কারো ব্যক্তিগত অপরাধ ও অপকর্মের দোষ গোটা কমিউনিটির উপর চাপানো অনুচিত ও অনভিপ্রেত। এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও যে জঙ্গী তৎপরতায় জড়িত তা পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসী জেনেছে। সুতরাং জঙ্গীবাদের অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ কেবল আহলেহাদীছ জনগণের প্রতি কেন করা হবে? বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য জঙ্গীবাদের সাথে আহলেহাদীছ জনগণ এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পৃক্ততার একটা পরিসংখ্যান আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই।

(১) পূর্বোক্ত রিপোর্টে জনাব মেহেদী হাসান পলাশ আরো বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাবী করে দেশে তাদের দেড় কোটি অনুসারী আছে। সে হিসাবে মোট আহলেহাদীছ অনুসারীদের মাত্র ০.৭৩% জেএমবি'র কর্মী বা সমর্থক। অর্থাৎ ৯৯.২৭% আহলেহাদীছ জেএমবি'র এই জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। কাজেই জেএমবি উত্থানের জন্য ঢালাওভাবে আহলেহাদীছ অনুসারীদের কোনভাবেই দায়ী করা যায় না।[১৮১]

(২) আরেকটি জাতীয় পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে জনমনে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, জেএমবি নেতাকর্মীদের অধিকাংশ আহলেহাদীছ মতাদর্শের অনুসারী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এদের ৬৩.৬৩ শতাংশ দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে ভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের অনুসারী)। জরিপে অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে মাত্র ৩৬.৩৬ শতাংশ আহলেহাদীছ গোত্রের সদস্য।[১৮২]

উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায় যে, জঙ্গীদের মধ্যে আহলেহাদীছ অনুসারী লোকের সংখ্যা যত অন্য মাযহাবের লোক সংখ্যা তার দ্বিগুণের চেয়েও অনেক বেশি। সুতরাং জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত আহলেহাদীছ ঘরে জন্ম নেওয়া নগণ্য সংখ্যক লোকের কারণে পুরা আহলেহাদীছ জামা'আতকে জঙ্গীবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করা সমীচীন নয়। কেননা একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে দোষারোপ করা বা অপরাধী সাব্যস্ত করা ইসলামী শরী'আতে বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَـــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـــرَى.

---

১৮১. ***দৈনিক ইনকিলাব,*** ১১ মার্চ ২০০৭, পৃঃ ১-২।
১৮২. ***দৈনিক যায়যায়দিন,*** ২৬ আগষ্ট, ২০০৬, পৃঃ ১।

'কেউ অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪; বানী ইসরাঈল ১৫; ফাতির ১৮; নাজম ৩৮)*। অতএব ব্যক্তির দোষ সমষ্টির উপর চাঁপানো উচিত নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জঙ্গীবাদ

চরমপন্থী জঙ্গীদের অভিযোগ হচ্ছে এদেশে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, শিরক, বিদ'আত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত হয়। এ দেশের সংবিধান ইসলামী সংবিধান নয় এবং এদেশের অর্থব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয় না। বিধায় এদেশের সরকার ও তাদের সহযোগিতাকারী পুলিশ, বিডিআর, আর্মি, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিচারক সহ সবাই কাফির। তাই তাদের হত্যা করা, তাদের সম্পদ গনীমত হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয। এজন্য তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের খারিজীদের মতই এদেশের মুসলিম সরকারের আনুগত্য পরিহার করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

অভিযোগগুলি সত্য হলেও এদেশের মুসলিম শাসক ও সরকার প্রধান যেমন আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান পোষণ করেন, ছালাত, ছিয়াম পালন করেন, কোন কোন সময় যাকাত ও ওশর প্রদান করেন, হজ্জ-ওমরা সমাপন করেন, তেমনি ইসলামের কোন বিধানকে তারা অস্বীকার করেন না। নিজেরা সুদ-ঘুষ গ্রহণ করলেও কিংবা মদ পান করলেও এগুলিকে তারা হালাল ভাবেন না, মদ বিক্রয় ও পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দিলেও এগুলিকে তারা বৈধ জ্ঞান করেন না, আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করাকে তারা উত্তম ও হালাল জানেন না। সুতরাং যথেচ্ছা কাফির, মুরতাদ, মুনাফিক্ব ইত্যাদি ফৎওয়া দেওয়া মূর্খতা ও অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। এদেশের সরকার ও শাসকবর্গ ব্যক্তিজীবনে ধর্মভীরু ও কালেমায় বিশ্বাসী মুসলিম। তারা ইসলামের ৫টি মৌলিক রুকনে বিশ্বাসী ও আমলকারী। যদিও শয়তানের প্ররোচনায় এবং নিজেদের উদাসীনতার কারণে ইসলামের অনেক বিধান তারা যথাযথভাবে পালন করেন না, শরী'আত মোতাবেক চলেন না। স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। এজন্য তারা গোনাহগার হবেন কিন্তু তাদেরকে কাফির ফৎওয়া দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। তেমনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাও জায়েয নয়।

মূলতঃ কাফির ফৎওয়া দানের প্রবণতা খারেজীদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। তারা ছাহাবায়ে কেরামের চেয়ে কুরআন-হাদীছ বেশি বুঝে বলে দাবী করেছিল। শুধু তাই নয়, কুরআন-হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা করে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবায়ে কেরামকেও

কাফির ফৎওয়া দিয়েছিল এবং ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর মত খুলাফায়ে রাশিদুনের মহান দুই খলীফা সহ অনেক ছাহাবীকে হত্যা করেছিল। তারা ছাহাবায়ে কেরামের দ্বীনি ইলম ও গভীর জ্ঞান থেকে কোন ফায়দা হাছিল করতে সক্ষম হয়নি। তাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে আজো যারা 'হুঁশে কম জোশে বেশী' তারাও ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের দ্বীনি ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না। এসব চরমপন্থীরা মনে করে সালাফে ছালেহীন ছাহাবী ও তাবেঈদের অনুসারী হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝেন না। আবার কেউ কেউ বুঝলেও কাপুরুষতা বশতঃ তারা তা প্রচার করে না অথবা তারা সরকারের একান্ত আজ্ঞাবহ দাস। অথচ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মতে, অন্যান্য ধর্মের বিদ্বানগণ সর্বাধিক নিকৃষ্ট কিন্তু হক্কানী ওলামায়ে দ্বীন হলেন এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। কারণ ইতিহাস সাক্ষী যিনি যত বড় আলেম, তিনি ইসলামের ততবেশী খিদমত করেছেন। ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ তারা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালের চরমপন্থীদের নিকট ওলামায়ে কেরাম সর্বনিকৃষ্ট। এর কারণ হল হক্বপন্থী ওলামায়ে দ্বীন চরমপন্থীদের মতবাদ সমর্থন করেন না। খারেজী মতবাদপুষ্ট এই চরমপন্থী জঙ্গীরাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে নাশকাতমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তাদের মতে এদেশের সরকার যেহেতু কাফির সেহেতু তাদের আনুগত্য করা বা তাদের অধীনে চাকুরী করা হারাম। তেমনি নাচ-গান, যাত্রা, সিনেমা ইত্যাদি ইসলাম গর্হিত কাজ। সুতরাং এ কাজে যারা জড়িত তারাও কাফির। তাই তাদের হত্যা করা জায়েয। এ কারণে তারা যশোর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা সহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রা প্যাণ্ডেল ও সিনেমা হলে বোমা হামলা চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত অভিমত যে, কবীরা গোনাহকারী কাফির নয়, তাকে হত্যা করাও বৈধ নয়। সুতরাং যে দেশের মুসলিম সরকার ইসলামী বিধান পালনে বাধা দেয় না এবং যে দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী মুসলিম, সে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো বৈধ হতে পারে না। আর একে জিহাদও বলা চলে না। এসব জিহাদের নামে সন্ত্রাস। তাই দেশের সকল সচেতন নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে এসব সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও যুবসংঘ-এর জঙ্গীবিরোধী ভূমিকা

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তায় সদা সোচ্চার

এবং জাতির স্বার্থরক্ষায় তৎপর দু'টি দেশপ্রেমিক ইসলামী সংগঠন। যাদের লক্ষ্য হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামী সংগঠন বলতে ঐ সংগঠনকে বুঝায় যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রদত্ত অভ্রান্ত সত্যের উপর ভিত্তিশীল। যেখানে মানুষের দেওয়া কোন মতবাদ, কোন বিদ্বানের ব্যক্তিগত রায় ও কিয়াসের প্রাধান্য নেই। এক কথায় যে সংগঠন মানব সমাজে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনের প্রতি আহ্বান জানায়, তাকেই ইসলামী সংগঠন বলা হয়। রায় ও বিদ'আতপন্থীদের বিপরীতে চলে আসা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছপন্থীদের মাসলাক অনুযায়ী পরিচালিত পৃথিবীর অন্যান্য সংগঠনের ন্যায় এ সংগঠন কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির চিন্তাধারা, মতবাদ-মতাদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি; বরং এ সংগঠন দুনিয়ার মানুষকে রকমারী মতবাদ, ইজম, তরীকা ও চিন্তাধারার ধূম্রজাল থেকে মুক্ত করে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। এ সংগঠন 'পপুলার ইসলামে'র চাকচিক্য হতে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে 'পিওর' তথা খাঁটি ইসলামের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের আলোকে মানবতার মুক্তির জন্য অব্যাহত তৎপরতা চালায়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এদেশের অনন্য দু'টি ইসলামী সংগঠন। এরা কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান তালাশ করেন এবং সর্বাবস্থায় এতদুভয়ের সিদ্ধান্তকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়ে থাকেন। তারা তাক্বলীদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছই তাদের নিকট যাথার্থ ও অভ্রান্ত পথ প্রর্দশক। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কেবল তাকেই তারা ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রথম যুগের মূলনীতির দিকে প্রত্যার্বতন এবং তার মৌলিক সরলতা, আক্বীদা ও আমলের স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধারে তারা প্রচেষ্টা চালান।[১৮৩]

মূলত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে জীবন চলার পথে একমাত্র দিশারী হিসাবে গ্রহণ করে তার আদেশ-নিষেধকে সবকিছুর ঊর্ধ্বেস্থান দিয়ে তদনুযায়ী আমল করাই হচ্ছে এ সংগঠনদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য। এ অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যে সংগঠন **১৯৭৮** সালের ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে সুদীর্ঘ কালযাবৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে

---

১৮৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ ২০০৫), পৃঃ ৫১; ইবনু আবদিল মান্নান, আহলেহাদীছ যুগে যুগে, ***দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০ স্মরণিকা*** (রাজশাহী : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ১ম সংস্করণ, ২০০০), পৃঃ ২২।

আসছে, সে সংগঠন কখনো ইসলাম বিরোধী, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি এবং জাতির দুশমন জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদী কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রতি কোনরূপ সর্মথন দেয় না, তাদের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতাও রাখে না। দেশের আইন-শৃংখলাবিরোধী এবং দেশ ও জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোনরূপ সম্পর্ক, সংশ্লিষ্টতা ও সমর্থন অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ। বরং জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ যাবতীয় নাশকাতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উভয় সংগঠন সদা সোচ্চার। এ সংগঠনের বক্তব্য-বিবৃতি, লেখনি ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সবই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌত্বের পক্ষে এবং জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। এখানে আমরা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কতিপয় কর্মতৎপরতা উল্লেখ করতে চাই।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত :

□ ২০০০ সালের ১৩ আগষ্ট 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন স্বাক্ষরিত ৬৬/১-৩৮/২০০০ নং পত্রে জেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে জানানো হয় যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জিহাদের নামে কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বাসী নয়। ... কোন সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক বা সমর্থন নেই'।

□ ২০০১ সালের ৯ নভেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে, 'এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী, চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কোনরূপ সমর্থন বা সম্পর্ক নাই। এসব দলের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে সংগঠনের যে কোন স্তরের, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সময়ে সংগঠন হইতে বহিস্কৃত বলিয়া গণ্য হইবেন'।

□ কথিত জামা'আতুল মুজাহিদীন কর্তৃক প্রচারিত 'উসামা বিন লাদেন-এর জিহাদের ডাক' শীর্ষক প্রচারপত্রের প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, 'প্রচারপত্রে কথিত 'জামা'আতুল মুজাহিদীন'-এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে 'ক্বিতাল' বলে পরিচিতি লাভকারী চরমপন্থীদের প্রতিও আমাদের কোন সমর্থন নেই। আমাদেরকে

ঠাণ্ডা মাথায় দূরদর্শিতার সাথে সম্মুখে পা ফেলতে হবে। যেন আমাদের এই জিহাদী কাফেলাকে মাঝপথে কেউ জিহাদের ধোকা দিয়েই ধ্বংসের সুযোগ নিতে না পারে'।[১৮৪]

□ ২০০৩ সালের ১৯ আগষ্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে জানানো হয় যে, 'কোনরূপ চরমপন্থী ও জঙ্গী সংগঠনের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ইতিপূর্বেও কোন সম্পর্ক ছিল না, আজও নেই। আমরা এ ধরনের সকল প্রকার অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলাম এবং আছি'।

□ ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একটি নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠনের নাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। কোন জঙ্গীবাদী ও চরমপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এতদসত্ত্বেও যদি কোন কর্মী বিভ্রান্ত হয়ে সংগঠনের অগোচরে কোন চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে সে আমাদের সংগঠন হ'তে তৎক্ষণাৎ চিরতরে বহিস্কৃত বলে গণ্য হবে'।

মাসিক আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া :

মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর নিয়মিত বিভাগ 'প্রশ্নোত্তরে' আগষ্ট ২০০০ সংখ্যায় *(প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৩২৪)* জঙ্গীবাদ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলা হয়েছে যে, 'বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। ... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না'।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত অডিও সিডিতে ধারণকৃত বক্তব্য সমূহের অংশবিশেষ

১. ১৯৯৮ সালের ২৫ মে সাতক্ষীরার চিলড্রেন পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ :

"আপনারা বলুন! বোমাবাজির রাস্তা কি কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জায়েয আছে? বলুন! কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা কি জায়েয আছে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মান হামালা আলাইনাস সিলা-হ ফা লাইসা মিন্না' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুসলমানের বক্ষ লক্ষ্য করে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে মুসলমানের দলভুক্ত থাকল

১৮৪. *মাসিক আত-তাহরীক*, নভেম্বর'০১, পৃ. ৫৫।

না'। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আল-কাতেলু ওয়াল-মাকতূলু কিলা-হুমা ফিন-নার' অর্থাৎ 'হত্যাকারী এবং নিহত উভয় জাহান্নামী'। অতএব হাদীছ মাওজূদ থাকতে কেমন করে আমি আমার দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করতে পারি? অতএব বুলেটের রাজনীতি এদেশে চলবে না।''

২. **নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতেমা ২০০২-এ ২৮ ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত ভাষণ :**

''...'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এই তাবলীগী ইজতেমা একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে এ কারণে যে, আজকে আমাদেরকে বাংলাদেশের ৪টি জঙ্গীবাদী সংগঠনের অন্যতম সংগঠন হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটাকেই আবার বাংলাদেশের একটি বাংলা পত্রিকায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়েছে। এ সংখ্যা মাসিক **'আত-তাহরীকে'**ও আপনারা সে রিপোর্টটি পাবেন। এ দেশের আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনগণকে জঙ্গীবাদী বলে চিহ্নিত করার পিছনে কাদের যে কি মতলব রয়েছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আপনারা যারা বসে আছেন, আমরা কি কখনো আপনাদেরকে জঙ্গীবাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাংক লুট, গাড়ী ভাংচুর, ইন্ডিয়াতে গিয়ে কাশ্মীরে দাঙ্গাবাজী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলাম? দুর্ভাগ্য, আজ আমাদের উপরেই এই ব্লেইম দেওয়া হয়েছে।...

রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আজকাল মানুষের সামনে কিছু সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী সংগঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমরা ঐ ধরনের জিহাদে বিশ্বাসী নই।... মানুষের আক্বীদায় যদি পরিবর্তন না আসে, জিহাদ কাকে বলে সে নিজে যদি না বুঝে, মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যদি সে উপলব্ধি না করে, তাহ'লে শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে একটা মানুষকে বা একটা জাতিকে বা একটা পরিবারকে পরিবর্তন করা কি সম্ভব? কোনদিনই সম্ভব নয়। এর বাস্তব প্রমাণ সাড়ে ছয়শ' বছর ধরে দিল্লীতে মুসলমানরা সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছিল, হাতে অস্ত্র ছিল, বিরাট সেনাবাহিনী ছিল, টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না, যার প্রমাণ দিল্লীর দেওয়ানে খাছ, দেওয়ানে আম, আগ্রার তাজমহল, কুতুবমিনার, যার তুলনীয় একটা বিল্ডিং তৈরী করার ক্ষমতা ভারত সরকারের হয় নাই। এতকিছু দেওয়া সত্ত্বেও মুসলিম মাইনরিটি আজও পর্যন্ত খোদ দিল্লীতে। ১৯০ বছর ইংরেজরা এ দেশ শাসন করেছে, কই বাংলাদেশের মুসলমান বা হিন্দু ভাইরা কি খৃষ্টান হয়ে গেছেন নাকি? ১৯০ বছর ধরে শাসন করেও আমাদের আক্বীদার পরিবর্তন তারা করতে পারে নাই! বোঝা গেল রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে আর

অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে, আর সশস্ত্র হুমকি দিয়ে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নবীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে মানুষের সামনে আসে নাই। তাঁরা অস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁদের দাওয়াত ছিল আক্বীদা পরিবর্তনের দাওয়াত।... অতএব বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলাদেশের যমীনে যে কাজ করে যাচ্ছে সেটা নবীদের মৌলিক তরীকার কাজটিই করে যাচ্ছে। আক্বীদা পরিবর্তনের কাজ করে যাচ্ছে।''

৩. ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলানায়তনে ২৫ মে'০২ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ :

''আমাদের যে আন্দোলন চলছে, অন্যরা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এটা মোটেও ভাববেন না। ... আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলার যমীনে জোরেসোরে সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাক এটা কি অন্যরা পসন্দ করবে? আর সেজন্যই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার স্বার্থে জিহাদ ও কিতালের শ্লোগান তোলা হয়েছে। যাতে জিহাদের নাম করেই আহলেহাদীছ যুবসংঘের ছেলেদেরকে, আহলেহাদীছের এই তাজা মানুষগুলোকে টান দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আপনাদেরকে ভুলানো হচ্ছে জিহাদের নাম করে। খবরদার! এগুলো জিহাদ নয়, জিহাদের ব্যবসা।... যারা আজ জিহাদ করছে কালকে তারা খেতে পেত না। অথচ আজকে হোন্ডা নিয়ে আর মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অর্থ পাচ্ছে কোথায়?... আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন। জিহাদ ও কিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনি, আপনার সংগঠন খতম করা। ইসলামী দল বাংলাদেশে তো আরো রয়েছে, তাদের মধ্যে তো এগুলো নেই! কারণ টার্গেট আপনি। অতএব সাবধান হয়ে যান কোন ধোকায় পা দিবেন না।''

৪. নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩-এ ১৪ মার্চ প্রদত্ত ভাষণ :

''... আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, আমাদের শ্লোগান দা'ওয়াত ও জিহাদ শুনে অনেকের মনে ইতিমধ্যেই সন্দেহ হয়ে গেছে যে, এদের হাতে মনে হয় অস্ত্র আছে। হয়তবা বোমা নিয়ে বসে আছেন। আমি এখানে উপস্থিত সকল ভাইকে যাদেরকে আমি চিনি বা চিনি না সবাইকে লক্ষ্য করে বলছি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কোন রকম সরকার বিরোধী জঙ্গী তৎপরতায় বিশ্বাস করে না।

৫. ২০০৪ সালের ৫ নভেম্বর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা :

''বিদ'আতীরা কখনোই আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বরদাশত করে নাই। যখনই আন্দোলন এগিয়ে চলেছে তখনই এটাকে ছুরিকাঘাত করার জন্য চারিদিক থেকে শুরু হয়ে গেছে একেকটা পত্র বোমা আর লেখনীর বোমা। এখন আবার আহলেহাদীছদের মধ্যেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'মুজাহিদীনে'র নাম করে 'মুসলিমীনে'র নাম করে আমাদের ছেলেদেরকে নিয়ে যাচ্ছে চরমপন্থী আন্দোলনে। সাবধান থাকবেন। আপনার ছেলেকে যদি কেউ বলে, তুমি আমার জিহাদ মুভমেন্টে ঢুক, অস্ত্র প্রশিক্ষণ দাও, ঐতো জান্নাত দেখা যাচ্ছে। 'ইন্নি ওয়াজাদতু রায়হাতাল জান্নাহ মিন ওয়ারায়ে ওহোদ' অর্থাৎ 'ওহোদর পাহাড়ের অপর পার্শ্ব থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি'। এই হাদীছ শুনিয়ে শুনিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে কোন নিভৃত পল্লীতে গিয়ে অথবা কোন মসজিদের মধ্যে ঢুকে বোমা তৈরির টেকনিক শেখানো হচ্ছে। আহলেহাদীছের সন্তানদের মধ্যেই যারা আমাদের মুভমেন্ট করে, যারা যুবসংঘ করে তাদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনারা সাবধান থাকবেন। যদি কোন মসজিদে এই ধরনের প্রতারণামূলক কাজ করতে কেউ আসে, জিহাদের নাম করে ধোকা দিতে আসে, সরাসরি মসজিদ থেকে তাদেরকে বের করে দিবেন। এরা আহলেহাদীছ নয় এরা আহলেহাদীছের দুশমন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কস্মিনকালেও কোন চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। এরা কখেনোই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নয়। এরা কখনোই কোন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। মানুষকে জবরদস্তি করে, পিটিয়ে হত্যা করে, রাইফেলের ভয় দেখিয়ে, বোমা মেরে কস্মিনকালেও এরা মানুষকে হেদায়েতের দা'ওয়াত দেয় না। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যে তরীকায় মানুষকে আহ্বান করেছেন, সে তরীকায় আমরা মানুষকে আহ্বান করি। মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। কস্মিনকালেও বোমা মেরে মানুষকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ত তাহলে আমেরিকা সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু পারছে না। কাশ্মীরে বিগত ৫৬ বছর ধরে ভারত বোমা মারছে, কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে কি তারা হিন্দু বানাতে পেরেছে? ১৯০ বছর এই বাংলাদেশে ইংরেজরা শাসন করেছে, ইংরেজরা কি আমাদেরকে ইংরেজ বা খৃষ্টান বানাতে পেরেছে? অতএব বন্ধুরা আমার! আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্পষ্ট বিশ্বাস এই যে, রাসূলের তরীকায় শান্তি। আপনার লেখনি আপনার বক্তব্য আপনার সংগঠন সবই হবে হক্বের পক্ষে।''

৬. ২০০৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা :

"...বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বালাদেশ' এই বাংলাদেশের বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কার কামনা করে। আর সেটা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী আবশ্যক। আল্লাহর রাসূল যেভাবে মক্কা ও মদীনাতে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)-এর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ, যাদের তুলনীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই সৃষ্টি হবে না। দুর্ভাগ্য, ইতিহাস তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী বলেছে।... আজকেও যারা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে নওদাপাড়া মারকাযকে সন্ত্রাসের মারকায বানাচ্ছে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইমারতকে যারা নিকৃষ্টভাবে জঙ্গীবাদের সমর্থক মনে করেছে, মিথ্যা নিঃসন্দেহে একদিন পরাজিত হবে। সত্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।...

জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনোই এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কস্মিনকালেও জিহাদ করে না। তারা সন্ত্রাস করে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমা ববাজি করে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করে, তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। ওরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন। এদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। দুর্ভাগ্য আজ আমাদেরকেও তাদের সাথে শামিল করে ফেলা হয়েছে। আমি আহ্বান জানাব আহলেহাদীছ ভাইদেরকে, আহলেহাদীছ তরুণ ছেলেদেরকে, সাবধান হয়ে যাও, কোন চরমপন্থী আন্দোলনে ঢুকবে না। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মার খেয়েছেন, নিজের দেহ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, নিজের দাঁত ভেঙ্গেছে, তিনি রাস্তায় রাস্তায় গিয়েছেন, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছেন, মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করেছে, দারুণভাবে অপদস্ত করেছে তিনি কখনো একটি বদদো'আ পর্যন্ত করেননি।..."

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এ রকম বলিষ্ঠ বক্তব্য উপহার দেওয়ার পরও **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব,** তার সাথে **'আন্দোলন'**-এর তৎকালীন নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা ও মানহানিকর মামলা তাঁদের উপর চাপিয়ে দিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম কালো অধ্যায় রচনা করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে এসব ডকুমেন্ট বার বার সরকার ও জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায়ও রিপোর্ট হয়েছে। মিছিল-মিটিং-সমাবেশের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'আহলেহাদীছ

যুবসংঘে'র অবস্থান দেশবাসীর নিকটে পরিষ্কার হয়েছে। দেশের ঐ ক্রান্তিলগ্নে বিটিভি ও এনটিভিতেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতৃবৃন্দ জঙ্গীবিরোধী একাধিক অনুষ্ঠান করেছেন। একপর্যায়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব লুৎফুজ্জামান বাবর গত ২৯ সেপ্টেম্বর'০৫ তারিখে রাজশাহীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদের সাথে ডঃ গালিবের সম্পৃক্ত না থাকার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।[১৮৫] এমনকি জঙ্গীদের মূল হোতারাও এ বিষয়ে আদালতে পরিস্কার বক্তব্য তুলে ধরেছে যে, 'আমাদের সাথে ডঃ গালিবের কোন সম্পর্ক নেই'।[১৮৬]

মাসিক মদীনার সম্পাদক ও বর্ষীয়ান আলেম মাওলানা মহিউদ্দীন খান বলেন, I still cannot believe that Dr. Ghalib can be involved in any sort of terrorism. He is an educated man, an academic. He can`t be involved in militancy. ... I never heard of him being involved in any sort of terrorism. ... I knew Dr. Ghalib to be a gentleman.[187]

'আমি এখনো বিশ্বাস করি না যে, ড. গালিব কোন প্রকার সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। তিনি একজন শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত হতে পারেন না। ... কোন প্রকার সন্ত্রাসের সঙ্গে তাঁর জড়িত হওয়ার কথা আমি কখনো শুনিনি। ... আমি ড. গালিবকে একজন ভদ্রমানুষ হিসেবেই জানি'।

সর্বোপরি গত ৩১ জানুয়ারী'০৭ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী'০৭ তারিখ পর্যন্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলোতে' জঙ্গীবাদের উত্থান সম্পর্কে জঙ্গীদের স্বীকারোক্তিমূলক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত সিরিজ রিপোর্টেও ডঃ গালিব ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অবস্থান পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ সাজানো নাটক ও এক জঘন্যতম প্রহসন। যা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে। গত ২৮ মে যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেফতারকৃত বিগত সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর জেআইসির জিজ্ঞাসাবাদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন মর্মে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালেখি হয়েছে। তিনি গত সরকারের শেষ সময়ের 'হট ইস্যু' জঙ্গীবাদের উত্থান সম্পর্কেও নানা তথ্য দিয়েছেন। বিশেষ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে কিভাবে ফাঁসানো হয়েছে এ প্রসঙ্গে পরিস্কার তথ্য প্রকাশ করেছেন। যা গত ৫ জুন'০৭ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। জনাব বাবর তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন যে, দেশের যেকোন স্থানে

---

১৮৫. ***প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, ভোরের কাগজ,*** ৩০ সেপ্টেম্বর'০৫।
১৮৬. ***প্রথম আলো, যুগান্তর, ইনকিলাব, ডেইলী স্টার, করতোয়া,*** ১৬ মে '০৬।
১৮৭. ***Weekly Probe***, December 16-22, 2005, Vol.4, Issue 25, p. 16.

জঙ্গী ধরা পড়লে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নির্দেশেই তা ধামাচাপা দিতেন তিনি। ডিসি-এসপিরা তার নির্দেশে জঙ্গীদের জবানবন্দী পরিবর্তন করতেন। এসপিদের প্রতি নির্দেশ ছিল, কোথাও জঙ্গী ধরা পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানাতে হবে; এমনকি আইজি জানার আগেই। সূত্র মতে, ২০০৫ সালের ১৭ জানুয়ারী গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির সময় ৭ ডাকাত স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদেরকে ছিদ্দীকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের অনুসারী ও জেএমবি'র সদস্য পরিচয় দেয়। পুলিশ সুপার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানালে তিনি মামলার এজাহারে জঙ্গী লিখতে বারণ করে ডাকাতির মামলা রেকর্ডের নির্দেশ দেন। ২ ফেব্রুয়ারী'০৫ গোপালগঞ্জ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে তাদের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী নেয়া হয়। এই জবানবন্দীতেও তারা নিজেদেরকে জেএমবি'র সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে বাবরের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে দেয়া ৭ জঙ্গীর জবানবন্দী নথি থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এরপর গোপালগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক আব্দুর রঊফ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছালাউদ্দীনকে তার অফিস কক্ষে ডেকে এনে বলেন, জেআইসির গাইড লাইনে বলা হয়েছে, জবানবন্দীতে আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের নাম লেখা যাবে না। বরং আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর ডিসির নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট ছালাউদ্দীন ৫ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১-টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত তার অফিস কক্ষে ঐ ৭ জনের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী পুনরায় রেকর্ড করেন এবং ড. গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।[১৮৮]

এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গীদের স্বীকারোক্তি রদবদল করেই যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে ফাঁসানো হয়েছে উপরোক্ত ঘটনা থেকে তা সুস্পষ্ট। তাছাড়া ভয়-ভীতি দেখিয়ে ও মারপিট করে ধৃত কোন কোন জঙ্গীর ১৬৪ ধারা জবানবন্দীতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে সেখানে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে সেটি ঐ ধৃত জঙ্গীর জবানবন্দী বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম হাযারো মিথ্যা ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিগত জোট সরকার কর্তৃক ইতিহাসের বর্বরোচিত যুলুম চালানো হয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তার নির্দোষ নেতৃবৃন্দের উপর। আমরা মনে করি, যে আইনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা জামিন পায় অথচ নিরপরাধ মানুষ জামিন পায় না সে আইন অবশ্যই সংশোধনযোগ্য। এইরূপ নীতিহীন আইন দ্বারা দেশ পরিচালিত হ'লে সে দেশে কোনদিন কল্যাণ আসতে পারে না।

---

১৮৮. *দৈনিক আমাদের সময়,* ৫ জুন'০৭, পৃঃ ১।

তৃতীয় অধ্যায় : রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য

সৃষ্টির আদি থেকেই প্রত্যেক সম্প্রদায়েই কোন না কোন নেতা বা গোত্রপতি, সমাজ বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকতেন। তিনি সেই গোত্র, সমাজ বা দেশের মানুষকে পরিচালনা করতেন। বিশেষ করে মানুষের জান-মাল, ইয্যত-আব্রু রক্ষা, নিরাপত্তা বিধান, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা প্রতিরোধ, অত্যাচারী ও অপরাধীদের দমন ইত্যাদি কার্যাদি সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালনের জন্যই প্রয়োজন গোত্রপতি, সমাজ বা রাষ্ট্র প্রধানের। মহান আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করেন, 'আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধস্ত হয়ে যেত' *(বাক্বারাহ ২৫১)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ যদি পৃথিবীতে দুর্বলের পক্ষে শক্তিশালীকে প্রতিহত এবং যালিম কর্তৃক মাযলূম ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার দমন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে শাসক নিয়োগ না করতেন, তাহলে মানুষের একদল অপরদলের প্রতি অন্যায় করত। ফলে সমাজে কোন শৃংখলা, স্থিতিশীলতা থাকত না বরং পৃথিবী ও অধিবাসীদের মাঝে ফিৎনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হত।[১৮৯]

উল্লেখ্য যে, হাদীছে সুলতান, আমীর ও ইমাম প্রভৃতি শব্দ এসেছে। এগুলির অর্থ মূলত একই। উক্ত শব্দগুলির দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানকে বুঝানো হয়েছে। যিনি রাষ্ট্র বা দেশ শাসন ও পরিচালনা করে থাকেন।

শাসকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের অভিমত :

আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) বলেন, إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر وإن كان فاجرًا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفـــاجر فيهـــا إلى أجلـــه. 'নেতা ব্যতীত মানুষ তাদের (মধ্যকার) সমস্যার মীমাংসা করতে পারবে না, নেতা ন্যায়পরায়ণ হোক বা পাপাচারী হোক। যদি নেতা পাপাচারী হয় তাহলে মুমিন সেক্ষেত্রে তার কেবল রবের ইবাদত করবে আর পাপাচারীকে তার সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবে'।[১৯০]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بهـــا إلى الله، فـــإن التقرب إليه فيها بطاعة وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر النـــاس لإبتغـــاء

১৮৯. ***মুআমালাতুল হুক্কাম***, পৃঃ ৫৪-৫৫।
১৯০. ***ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ***, *পৃঃ ৫৮।*

الرياسة والمال. ‘দ্বীন পালন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নেতাকে ধারণ করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে যে নৈকট্য লাভ হয় তাই উত্তম। আর নেতৃত্ব ও সম্পদ চাওয়ার কারণে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয় বিশৃংখল বা গোলযোগপূর্ণ’।[১৯১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘এটা স্বীকার করা অত্যাবশ্যক যে, নেতৃত্ব হচ্ছে দ্বীনের ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়ার (কোন কর্মকাণ্ড) পরিচালনা নেতৃত্ব ব্যতীত হয় না। তাই পরস্পরের প্রয়োজনে একত্রিত হওয়া ব্যতীত আদম সন্তানের কোন কল্যাণ লাভ সম্পূর্ণ হবে না। আর সমবেত বা জমায়েত হওয়ার জন্য অবশ্যই একজন নেতা প্রয়োজন।... তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা‘আলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করাকে ওয়াজিব করেছেন। আর তা শক্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত সম্পন্ন হবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ কর্তৃক ওয়াজিবকৃত সমস্ত কাজ যেমন জিহাদ, অন্যান্য কর্মকাণ্ড, হজ্জ সমাপন, জুম‘আ পালন, ঈদ উদযাপন, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, হদ কায়েম করা ইত্যাদি শক্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। এজন্য বর্ণিত আছে যে, সুলতান বা শাসক হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া। আরো বলা হয়, শাসকবিহীন এক রাত অতিবাহিত করার চেয়ে অত্যাচারী শাসকের অধীনে ষাট বছর কাটানো অতি কল্যাণকর।[১৯২]

শাসকদের সম্পর্কে আল-হাসান বলেন, وهم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة، والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم والله لغيظ وأن فرقتهم لكفر. ‘তারা আমাদের ৫টি কাজকে সহজ করে দেয়। (১) জুম‘আ আদায় (২) জামা‘আত কায়েম (৩) ঈদ উদযাপন (৪) সীমান্ত রক্ষা (৫) হদ কায়েম করা। আল্লাহর কসম, শাসক ছাড়া দ্বীন যথাযথ পালন হবে না, যদিও সে অত্যাচারী হয়। আল্লাহর শপথ, তারা যে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তদপেক্ষা তাদের দ্বারা আল্লাহ অনেক বেশি কল্যাণকর কাজ করিয়ে থাকেন। যদিও তাদের আনুগত্য করা অতীব কঠিন, কিন্তু তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কুফরী।[১৯৩]

ইসলামে শাসকের আনুগত্য করার জন্য বিশষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَطِيْعُواْ اللّهَ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ. ‘হে মুমিনগণ!

১৯১. *মাজমূউ ফাতাওয়া,* ২৮শ’ খণ্ড, পৃঃ ৩৯০।
১৯২. *ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ,* পৃঃ ৫৬-৫৭।
১৯৩. *ঐ,* পৃঃ ৫৮।

তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের' *(নিসা ৫৯)*।

রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকের আনুগত্য সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার সাথে নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্র সাথে নাফরমানী করল। আর যে আমীর বা শাসকের আনুগত্য করল, সেও আমার আনুগত্য করল। পক্ষান্তরে যে আমীর বা শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করল, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করল'।[১৯৪]

عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.

হারিছ আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি- (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের বা শাসকের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হতে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হয়ে গেল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহিলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম'।[১৯৫]

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وفي رواية إلا أن تروا كفرًا بواحا عندكم من الله فيه برهان.

১৯৪. ***বুখারী,*** হাদীছ নং ২৭৩৭; ***মুসলিম,*** হাদীছ নং ১৮৩৫; ***রিয়াযুছ ছালেহীন***, হাদীছ নং ৬৭১।
১৯৫. ***আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত***, তাহক্বীক্ব-আলবানী, হাদীছ নং ৩৬৯৪, 'ইমরাত' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

উবাদাহ ইবনুছ ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, আমরা আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হোক, স্বাচ্ছন্দ্যে হোক, আনন্দে হোক, অপছন্দে হোক বা আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়ে হোক। আর আমরা বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করব না। অন্য বর্ণনায় আছে, আমীরের মধ্যে প্রকাশ্যে কুফরী না দেখা পর্যন্ত, যে বিষয়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের নিকটে নির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে।[১৯৬]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, أي نص أو خبر صحيح لا يحتمل التاويل ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التاويل. 'পবিত্র কুরআন অথবা ছহীহ হাদীছ দ্বারা (কুফরী) সাব্যস্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে না। এতে স্পষ্ট হয় যে, যতক্ষণ তাদের কর্মকাণ্ড অনুমান বা সন্দেহের আড়ালে থাকবে ততক্ষণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে পৃথক হওয়া বৈধ নয়'।[১৯৭]

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) ঐ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, শাসকদের শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ কর না এবং তাদের উপর হস্তক্ষেপও কর না। যতক্ষণ তোমরা তাদের মধ্যে প্রকাশ্য মুনকার তথা সুস্পষ্ট গর্হিত কাজ প্রত্যক্ষ না কর, যা তোমরা ইসলামের মূলনীতি সমূহের আলোকে জানতে পারবে। যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের ঐ কাজের বিরোধিতা করবে এবং তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখানেই হক্ব কথা বলবে। তিনি আরো বলেন, 'আর তাদের দল থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে হত্যা করা মুসলমানদের ঐক্যমতে হারাম। যদিও তারা অত্যাচারী ফাসেকও হয়। আমি যা উল্লেখ করলাম হাদীছগুলি সে অর্থই প্রকাশ করে। তাছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, ফাসেকী কর্মের অপরাধে শাসকদেরকে অপসারণ করা যাবে না'।[১৯৮]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

---

১৯৬. ***মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৬৬, 'ইমারত অধ্যায়।
১৯৭. হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী, ***ফাৎহুল বারী,*** ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১০।
১৯৮. ***মুসলিম শরহে নববী*** (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬ খৃঃ), ১১-১২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৩৩, হা/৪৭৪৮ 'ইমরাত' অধ্যায়।

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমীরের বা শাসকের প্রতি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার জন্য (ওযর হিসাবে) কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের) বায়'আত নেই, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[১৯৯]

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমীরের বা শাসকের নির্দেশ শ্রবণ কর ও মান্য কর। যদিও তোমাদের উপরে কিসমিসের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হাবশী কৃতদাসকে শাসক নিয়োগ করা হয়'।[২০০]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার জন্য একান্ত কর্তব্য হচ্ছে শাসকের আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা, তোমার কষ্টে হোক, স্বাচ্ছন্দ্যে হোক, আনন্দে হোক, অপছন্দে হোক অথবা তোমার উপরে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক'।[২০১]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান বা দেশের শাসকের আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তারা যদি কোন পাপ কাজ বা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণের নির্দেশ দেন তবে তা মানা যাবে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পছন্দে হোক আর অপছন্দে হোক রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা। তবে তারা কোন ব্যাপারে আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দিলে তা শ্রবণ করা যাবে না এবং আনুগত্যও করা যাবে না'।[২০২]

---

১৯৯. ***মুসলিম, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৭৪।
২০০. ***বুখারী,*** 'আহকাম' অধ্যায়; ***মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৬৩; ***রিয়াযুছ ছালেহীন,*** হাদীছ নং ৬৬৬।
২০১. ***মুসলিম,*** 'ইমরাত' অধ্যায়; ***নাসাঈ; রিয়াযুছ ছালেহীন,*** হাদীছ নং ৬৬৭।
২০২. ***বুখারী, মুসলিম,*** হাদীছ নং ১৮৩৯; ***আবুদাউদ,*** হাদীছ নং ২৬২৬; ***তিরমিযী,*** হাদীছ নং ১৭০৭।

রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমত

১. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'সম্পদ বণ্টন, বিচার-ফায়ছালা, যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করা প্রজাদের জন্য ওয়াজিব, যদি তাঁরা আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ না দেয়। তারা আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দিলে আল্লাহর নাফরমানীতে সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই। আর তারা যদি কোন বিষয়ে বিরোধ করে তাহলে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে যাবে। শাসকগণ এরূপ না করলে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দিলে তাদের আনুগত্য করতে হবে। কেননা এটাই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুসরণ'।[২০৩]

২. সউদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হল সৎকাজে শাসকের আনুগত্য করা, কিন্তু নাফরমানীর ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং যখন তারা অবাধ্যতার নির্দেশ দিবে তখন আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর কারণে। তিনি বলেন, 'সাবধান! যাকে কারো দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয় সে যদি আল্লাহর অবাধ্যতার কোন নির্দেশ দেয় তাহলে সে যেন তা অপছন্দ করে। তবে তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না' *(মুসলিম, হা/২৪২৮; আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪, ২৮)*।[২০৪]

৩. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই শাসকের আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুমিন আইনত প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিয়ম-নীতির উপর চলবে, যদি সেটা শরী'আতের পরিপন্থী না হয়। সুতরাং সে উহার উপর যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে থাকবে। আর তার

---

২০৩. عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر الفاعلين لذالك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن تنازعوا في شيئ ردوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة أمر الله ورسوله. দ্রঃ ***ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ,*** *পৃঃ ৫৩-৫৪।*

২০৪. فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم ألا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة. দ্রঃ ***ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ,*** পৃঃ ৬১-৬২।

এ আমলের জন্য ছাওয়াব পাবে। আর যে এর বিপরীত করবে সে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হবে এবং এজন্য সে পাপী হবে'।[২০৫]

৪. ইবনু রজব বলেন, وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. 'মুসলিম শাসকের নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার কল্যাণ। এর দ্বারাই বান্দার জীবন-যাপনে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়। এর দ্বারা দ্বীনকে প্রকাশ করতে এবং আল্লাহর আনুগত্যে তারা সাহায্য লাভ করে থাকে'।[২০৬]

রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্মান করা :

রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্মান করতে হবে, তাকে অপমান-অপদস্ত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সম্মান করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সম্মান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অপদস্ত করবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকে অপদস্ত করবেন'।[২০৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهان السلطان أهانه الله. আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধানকে অপমানিত করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন'।[২০৮]

জনগণের কাছে শাসকের অধিকার সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন বলেন,

ومن حقوق الولاة على رعيتهم: السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ما لم يكن في ذلك مخالفة لشريعة الله، فإن كان في ذلك مخالفة لشريعة الله فلا سمع لهم ولا طاعة.

---

২০৫. إن من طاعة ولاة الأمر التي أمر الله بها: أن يتمشى المؤمن على أنظمة حكومته المرسومة إذا لم تخالف الشريعة، فمتى تمشي على ذلك كان مطيعا لله ورسوله، ومثابا على عمله، ومن خالف ذلك كان عاصيا لله ورسوله وآثما بذلك. দ্রঃ *আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর*, পৃঃ ৭৩।

২০৬. *ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ,* পৃঃ ৫৭-৫৮।

২০৭. *মুসনাদে আহমাদ,* হা/১৯৫৩৮; সিলসিলা ছহীহ হা/২২৯৭, ৫/৩৭৬ পৃঃ।

২০৮. *তিরমিযী* হা২২২৪, সনদ হাসান; *রিয়াযুছ ছালেহীন,* পৃঃ ২৪৩, হা/৬৭৩।

‘প্রজাদের নিকটে শাসকদের হক হল তারা শাসকদের নির্দেশ শুনবে এবং তার আদেশ প্রতিপালন ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনের মাধ্যমে তার আনুগত্য করবে, যতক্ষণ তা আল্লাহর শরী‘আতের পরিপন্থী না হয়। কিন্তু যদি সেটা আল্লাহর শরী‘আতের পরিপন্থী হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শ্রবণ করতে হবে না এবং আনুগত্যও করতে হবে না’।[২০৯]

শাসককে উপদেশ দেয়া :

রাষ্ট্রের শাসক হন একজন মানুষ। মানুষ হিসাবে তার নানা ভুল-ত্রুটি হতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে উপদেশ দিতে হবে এবং তার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن الله يرضي لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبـــل الله جميعـــا ولا تفرقوا وأن تناصحوا مـــن ولاه الله أمـــركم. ‘আল্লাহ তা‘আলা তিনটি কাজে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। (১) তোমরা তাঁর ইবাদত করলে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে। (২) আল্লাহর রজ্জুকে একতাবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে এবং দলে দলে বিভক্ত না হলে। (৩) তোমাদের জন্য আল্লাহ যাকে শাসক নিযুক্ত করেছেন তাকে উপদেশ দিলে’।[২১০]

শাসকদের উপদেশ প্রদান সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন বলেন,

فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفويًا أو كتابيا ونناصحهم، ســالكين بذلك أقرب الطرق ببيان الحق لهم وشرح خطئهم، ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ورعاية مصالحهم ورفع الظلم عنهم ونذكرهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‘শাসকদের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে আমরা মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করব এবং তাদের উপদেশ দিব। তাদের নিকট হক্ব বর্ণনায় ও তাদের ত্রুটি ব্যাখ্যায় আমরা সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি অনুসরণ করব। অতঃপর তাদেরকে হিতোপদেশ দেব ও তাদের অধীনস্থদের প্রতি তাদের কর্তব্য তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেব প্রজাদের কল্যাণের জন্য এবং তাদের নিকট থেকে যুলুম দূরীভূত করার জন্য। আর আমরা নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ (বিধান) তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেব’।[২১১]

---

২০৯. *আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর*, পৃঃ ৭২।
২১০. *মুওয়াত্ত্বা মালিক*, হাদীছ নং ১৮৬৩, ‘সম্পদ ধ্বংস হওয়া’ অনুচ্ছেদ; *মুসনাদ আহমাদ*, হাদীছ নং ৮১৩৪।
২১১. *ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ*, পৃঃ ৭১।

রাষ্ট্রপ্রধানের পরিশুদ্ধির জন্য দো‘আ করা :

শাসক যদি ফাসেক বা গোনাহগার হয় তাহলে তার পরিশুদ্ধির জন্য দো‘আ করতে হবে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال قلنا يا رسول الله! أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة.

আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দো‘আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দো‘আ করে। আর তোমাদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, যাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিব না? তিনি বললেন, না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে। না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে’।[২১২]

তাবিঈ আবু ওছমান আয-যাহেদ বলেন, ‘তুমি শাসককে উপদেশ দান কর এবং তার কল্যাণ কামনা কর, তার পরিশুদ্ধি ও সঠিক পথে চলার জন্য দো‘আ কর, ... সাবধান! তাদের উপরে অভিশাপের দো‘আ কর না। কারণ তা সমাজে মন্দ প্রভাবকে বৃদ্ধি করবে এবং মুসলমানদের বিপদাপদও বৃদ্ধি পাবে। তাদের জন্য তওবা কামনা করে দো‘আ করবে। এর ফলে হয়তো শাসক অমঙ্গলজনক কর্মকে পরিত্যাগ করবে এবং মুমিনদের উপর থেকে বিপদ অপসারিত হবে’।[২১৩]

ফুযাইল ইবনু আয়ায, আহমাদ ইবনু হাম্বলের মত পূর্বসূরী অনেকে বলেন, لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. ‘আমাদের জন্য যদি কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন কোন দো‘আ থাকত তাহলে আমরা তা দেশের শাসকের জন্য করতাম’।[২১৪]

---

২১২. ***মুসলিম***, হাদীছ নং ১৮৫৫; ***রিয়াযুছ ছালেহীন***, পৃঃ ২৪০-৪১, হাদীছ নং ৬৬১।

২১৩. فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء والصلاح والرشاد ... وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرًا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن يدعو لهم بالتوبة فيترك الشر ويرتفع البلاء عن المؤمنين. দ্রঃ বায়হাক্বী, ***শু‘আবুল ঈমান***।

২১৪. ***ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ***, পৃঃ ৫৮।

শাসকের দোষ-ত্রুটি প্রচার না করা :

রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক কোন ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ করলে তা প্রচার করে বেড়ানো অনুচিত এবং কৃত অপরাধের জন্য তাদেরকে গালমন্দ করাও ঠিক নয়। বরং তার সংশোধনের জন্য নির্জনে তাকে উপদেশ দেয়া বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. 'যে ব্যক্তি কোন শাসককে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে চায়, সে যেন তা প্রকাশ্যে না দেয়। বরং তাকে নির্জনে নিয়ে যেন উপদেশ প্রদান করে। সে যদি গ্রহণ করে তবে তো ভালই, অন্যথায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে আদায় করল'।[২১৫]

সরাসরি সাক্ষাৎ করে নির্জনে রাষ্ট্রপ্রধানের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেওয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতি না থাকলে পত্রের মাধ্যমে অথবা শাসকের নাম উল্লেখ না করে কৌশলে ত্রুটির বিষয়গুলি প্রবন্ধ/নিবন্ধ আকারে লিখে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে তাদেরকে সংশোধনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অথবা যারা তাদের নিকট প্রবেশের সুযোগ পায় তাদের মাধ্যমে ঐসব বিষয়গুলি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসকের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করা :

দেশের শাসক যদি অত্যাচারী হয়, তাহলে তাঁর অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কিন্তু তাঁর আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া যাবে না; বরং তাঁর আনুগত্যের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. 'আমার পরে কতিপয় শাসকের আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাতকে ধারণ করবে না। তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকবে যাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তরের ন্যায়। তখন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে সময় যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে কি করব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি শাসকের কথা শ্রবণ করবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমাকে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তুমি তাঁর কথা শ্রবণ করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে'।[২১৬]

---

২১৫. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ***যিলালুল জান্নাত ফী তাখরীজে হাদীছে কিতাবিস সুন্নাহ,*** হা/১০৯৬।
২১৬. ***মুসলিম,*** হা/১৮৪৭; ***মিশকাত,*** হাদীছ নং ৫৩৮১; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৫১৪৯।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية.

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি তার শাসকের মধ্যে অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি শাসক থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায়, সে অবশ্যই জাহেলী মৃত্যুবরণ করবে'।[২১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. 'কেউ যদি আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে, তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে এটা জাহেলী মৃত্যু বলে গণ্য হবে'।[২১৮]

শাসক অত্যাচারী হলেও তার অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে তাঁর আনুগত্য করতে হবে, যতক্ষণ না তিনি আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেন এবং যতদিন তিনি ছালাত আদায় করেন। তিনি যদি অন্যায়ভাবে প্রহার করেন কিংবা অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেন, তবুও তাঁর আনুগত্য করতে হবে। এক্ষেত্রে হরতালের নাম করে গাড়ী ও দোকানপাট ভাঙচুর করা এবং বিভিন্নভাবে ধর্মঘট করে দেশের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে কোন সরকারকে অপসারণের প্রচেষ্টা শরী'আতে আদৌ জায়েয নয়। হাদীছে এসেছে,

عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، لا ما صلوا.

উম্মু সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে যারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কাজ করবে। তোমরা তা বুঝতে পারবে এবং অপছন্দও করবে। সুতরাং যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি শাসকের এ মন্দ কাজকে মনে মনে খারাপ জানবে সে ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। অর্থাৎ গুনাহ হতে

---

২১৭. ***বুখারী,*** 'ফিতান' অধ্যায়, ***মুসলিম,*** 'ইমারাত' অধ্যায়, ***তিরমিযী,*** হাদীছ নং ২২২৫; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৪৯৯; ***রিয়াযুছ ছালেহীন,*** হাদীছ নং ৬৭২, পৃঃ ২৪৩।

২১৮. ***বুখারী,*** 'ফিতান' অধ্যায়, ***মুসলিম,*** 'ইমারাত' অধ্যায়, ***মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৬৮; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৪৯৯।

বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজের উপর সন্তোষ প্রকাশ করবে এবং উক্ত কাজে শাসকের আনুগত্য করবে, সে ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে তার সাথে শরীক হবে। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, যতদিন পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। আবার বললেন, যতদিন পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না'।[২১৯]

আবুদল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, 'অচিরেই তোমরা আমার মৃত্যুর পরে এমন স্বার্থপর শাসক এবং শরী'আত বিরোধী কাজ দেখতে পাবে যা, তোমরা অপছন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাদের প্রাপ্য তাদেরকে পরিশোধ করে দাও এবং নিজেদের প্রাপ্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর'।[২২০] অত্র হাদীছে অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর নিজেদের হক আল্লাহ্র নিকট থেকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করার আদেশ করা হয়েছে।

ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, একবার সালমা ইবনু ইয়াযীদ জু'ফী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি আদেশ করেন, যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে, যে আমাদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা'।[২২১]

উল্লেখ্য যে, (১) শাসকের দায়িত্ব প্রজাবৃন্দের প্রতিপালন করা এবং তাদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করা। (২) প্রজার দায়িত্ব হল আনুগত্য করা এবং কোন অনাচারের মুখোমুখি হলে বিরোধিতা না করে ধৈর্যধারণ করা। শাসকের আদেশ শ্রবণ করা এবং তা যথাযথ মান্য করা।

অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমত :

২১৯. ***মুসলিম, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৭১; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৫০২।
২২০. ***বুখারী, মুসলিম, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৭২; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৫০৩।
২২১. ***মুসলিম, মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৬৭৩; ***বঙ্গানুবাদ মিশকাত,*** হাদীছ নং ৩৫০৪।

দাউদী (রহঃ) থেকে ইবনু তীন বর্ণনা করেন, الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. ‘স্বৈরশাসকদের সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের যে সিদ্ধান্ত তা হল, বিপর্যয় ও সীমালংঘন ব্যতিরেকে যদি তাকে অপসারণ করা সম্ভব হয়, তাহলে তা অবশ্য করণীয় হবে। অন্যথা ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব’।[২২২]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ‘অত্যাচারী শাসকদের উপর ধৈর্যধারণ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি সমূহের অন্যতম’।[২২৩]

কুরআন ও হাদীছের উল্লিখিত দলীল ও মুহাক্কিক্ব বিদ্বান মণ্ডলীর বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাসকদের নির্দেশ শ্রবণ করা ও তা মান্য করা ওয়াজিব এবং তাদের বিরোধিতা করা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। দ্বীনী ও পার্থিব কল্যাণ সাধন নেতৃত্ব ছাড়া সুসম্পন্ন হয় না এবং শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে জামা‘আত প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। তাদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রদান ও যুদ্ধের আহ্বান হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত যে নীতির উপরে আছেন তার বিরোধিতা।

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা :

দেশের শাসক স্বৈরাচারী, অত্যাচারী হলেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ইসলাম সমর্থন করে না। বরং ইসলাম সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করারই নির্দেশ দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ না দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সাবধান! কোন ব্যক্তিকে যখন কারো উপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়, অতঃপর সে অবাধ্যতামূলক কিছু করে, তাহলে সে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কর্মকেই ঘৃণা করবে, কোন ক্রমেই দায়িত্বশীলের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না’।[২২৪]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.

---

২২২. *ফাৎহুল বারী*, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১০; *মুসলিম শারহ নববী*, ১১-১২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৩৫, ৪৪০, হা/৪৭৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ‘ইমারত’ অধ্যায়।

২২৩. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২৭।

২২৪. *মুসলিম,মিশকাত*, হাদীছ নং ৩৬৭০; *বঙ্গানুবাদ মিশকাত*, হাদীছ নং ৩৫০৩।।

আবু হুনাইদাহ ও অয়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, একবার সালমা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)! আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি আদেশ করেন, যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে, যিনি আমাদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চান, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা'।[২২৫]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাসকের মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী না দেখা পর্যন্ত তাঁর আনুগত্য করতে হবে।[২২৬] তেমনি আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তার নিদের্শ প্রতিপালন করতে হবে।[২২৭]

শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

(১) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'কোন কোন সম্প্রদায় জ্ঞানার্জন করা বাদ দিয়ে ইবাদতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়। ফলে তারা তরবারী ধারণ করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যদি তারা জ্ঞানের অনুসরণ করত তাহলে তা তাদেরকে সেই অন্যায় পথ হতে বিরত রাখত।[২২৮]

(২) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা অবৈধ। যে ব্যক্তি এরূপ কাজে জড়িত হবে সে বিদ'আতী ও সুন্নাতী তরীকার বিরুদ্ধাচরণকারী'।[২২৯] তিনি আরো বলেন, 'সৎ ও অসৎ সকল রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতাদের আনুগত্য করতে হবে। তেমনি যিনি রাষ্ট্রপ্রধানের স্থলাভিষিক্ত এবং লোকেরা যাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে কিংবা জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণ যাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাঁরও আনুগত্য করতে হবে'।[২৩০]

কুরআন সৃষ্ট সম্পর্কিত বিতর্কে বাগদাদের ফক্বীহগণ আল-ওয়াছিক বিল্লাহর বিরুদ্ধে আহমাদ ইবনু হাম্বলের নিকট সমবেত হলে তিনি বলেন, 'তোমাদের জন্য আবশ্যক হল অন্তরে ঘৃণা করা, কিন্তু আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিবে না। আর তোমরা মুসলিমদের

---

২২৫. ***মুসলিম,*** হাদীছ নং ১৮৪৬; ***রিয়াযুছ ছালেহীন,*** পৃঃ ২৪৩, হাদীছ নং ৬৬৯।
২২৬. ***মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত,*** হা/৩৬৬৬, 'ইমারত' অধ্যায়।
২২৭. ***মুসলিম,*** হা/১৮৫৫; ***রিয়াযুছ ছালেহীন,*** পৃঃ ২৪০-৪১, হা/৬৬১।
২২৮. إن أقوامًا اتبعوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا علي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. দ্রঃ ***মিফতাহু দারিস সাআদাহ,*** ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯।
২২৯. লালকাঈ, ***শারহু উছূলিল ইতিকাদ,*** ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১; ***হাক্বীক্বাতুল খাওয়ারিজ,*** পৃঃ ২৯।
২৩০. লালকাঈ, ***শারহু উছূলিল ইতিকাদ,*** ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১; ***হাক্বীক্বাতুল খাওয়ারিজ,*** পৃঃ ৭৬।

ঐক্যের দূর্গে ফাটল ধরাবে না, তোমাদের রক্ত প্রবাহিত করবে না ও তোমাদের সাথে মুসলমানদের রক্ত ঝরাবে না। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখবে। ধৈর্যধারণ কর যাতে পুণ্যবান ব্যক্তি শান্তি পায় এবং পাপী থেকে মুক্তি লাভ হয়'।[২৩১]

(৩) বারবাহারী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, সে ব্যক্তি খারেজী (বিদ্রোহী) ও মুসলমানদের শক্তি বিনষ্টকারী এবং সুন্নাতের বিরোধিতাকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তা হবে জাহিলী মৃত্যু।[২৩২]

(৪) ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, ধৈর্য ধারণ করে অত্যাচারী শাসকের আনুগত্যে অটল থাকা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার চেয়ে উত্তম। কেননা তাঁর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়া, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, অস্ত্র ধারণের মাধ্যমে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা, রক্ত প্রবাহিত করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর মাধ্যমে যমীনে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার শামিল'।[২৩৩]

(৫) ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, তারা রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং তাঁদের বিপক্ষে যুদ্ধ করাকে অবৈধ মনে করেন, যদিও তাঁরা অত্যাচারী স্বভাবের হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত বহু প্রসিদ্ধ ছহীহ হাদীছই এর প্রমাণ বহন করে। কারণ বিদ্রোহের মাধ্যমে যে ফিৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়, তা শাসকদের অত্যাচারের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। ক্ষুদ্র কোন বিপর্যয়কে মোকাবিলা করতে গিয়ে বৃহৎ কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করা যাবে না। আর শাসকদের আনুগত্য পরিত্যাগ করাই সেই বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কেননা ইতিপূর্বে যে দলই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করেছে ও বিদ্রোহ করেছে তারাই ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে'।[২৩৪]

(৬) ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ যদি আরো বড় ধরনের অন্যায়ের আবির্ভাব ঘটায়, যেরূপ সরকার ও রাষ্ট্রের পরিচালকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মাধ্যমে ঘটে থাকে, তাহলে তা হবে সমস্ত অন্যায়, অনাচার ও ফিৎনার মূল'।[২৩৫] তিনি আরো বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) শাসক বা রাষ্ট্রীয়

---

২৩১. عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح مـــن فـــاجر. দ্র: ***ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ,*** *পৃঃ ৫৮।*
২৩২. ***শরহুস সুন্নাহ,*** পৃঃ ৭৬; ***হাক্বীক্বাতুল খাওয়ারিজ,*** পৃঃ ২৯।
২৩৩. আল্লামা কুরতুবী, ***আল-জামিউলি আহকামিল কুরআন,*** ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯; ***হাক্বীক্বাতুল খাওয়ারিজ,*** পৃঃ ৩০।
২৩৪. ***মিনহাজুস সুন্নাহ,*** ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯১।
২৩৫. ***ইলামুল মুওয়াক্কিঈন,*** ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫; ***হাক্বীক্বাতুল খাওয়ারিজ,*** পৃঃ ৮৩।

ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছালাত কায়েম করবে। যদিও তারা অত্যাচারী হয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে সে পথ রুদ্ধ করার জন্যই এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঐ ঘটনাই ঘটেছিল। এই অকল্যাণকর মত ও পথের উপর কিছু সংখ্যক বিপথগামী লোক অদ্যাবধি অবশিষ্ট রয়েছে'।[২৩৬]

(৭) শায়খ আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, 'প্রজাদের জন্য শাসকদের বিরোধিতা করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নয় যতক্ষণ না তারা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখতে পায়, যে সম্পর্কে তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে। অন্যথা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল বিশাল ফাসাদ ও মহা অকল্যাণের কারণ হবে। যার দ্বারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, প্রজাদের হক্বসমূহ বিনষ্ট হবে, অত্যাচারীকে প্রতিহত করা এবং অত্যাচারিতকে সহযোগিতা করা কষ্টসাধ্য হবে। বরং শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সকল পথকে রুদ্ধ করবে ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে। ফলে গোলযোগ ও অনিষ্ট বৃদ্ধি পাবে। তবে যদি মুসলমানরা তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখে যে সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিকট দলীল রয়েছে, তাহলে সামর্থ্য থাকলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে তারা বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকবে। অথবা বিদ্রোহ করা যদি অধিক ক্ষতির কারণ হয়, তাহলেও বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে তারা বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকবে। এক্ষেত্রে শারঈ নিয়ম হচ্ছে অধিক ক্ষতিকর জিনিস দ্বারা কম ক্ষতিকর বস্তুকে দূরীভূত করা বৈধ নয়; বরং অনিষ্টকর জিনিসকে এমন বস্তু দ্বারা দমন করা ওয়াজিব যা ঐ অনিষ্টকে দূর করতে কিংবা হালকা করতে পারে'।[২৩৭] তিনি আরো বলেন, 'যদি শাসকের মধ্যে আল্লাহ্র অবাধ্যতামুলক অপরাধ পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাঁর নির্দেশ মান্য না করা ও আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়া খারেজী ও মু'তাযিলাদের মতে ধর্মীয় কর্তব্য'।[২৩৮]

(৮) শায়খ ইবনু উছাইমীন (রহঃ) বলেন, 'কোন কোন নির্বোধ মূর্খ লোকের বক্তব্য হচ্ছে শাসক যদি ইসলামকে পূর্ণরূপে মান্য না করে তাহলে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। একথা ভুল। এটি ইসলামী শরী'আতের কোন কিছুর মধ্যেই পড়ে না। বরং এটি খারেজীদের অভিমত'।[২৩৯]

---

২৩৬. *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭১।
২৩৭. *ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ,* পৃঃ ৬২-৬৩।
২৩৮. *আল-ফাতাওয়া আশ-শারঈয়্যাহ*, পৃঃ ১৪; *হাক্বীক্বাতুল খাওয়ারিজ*, পৃঃ ২৯।
২৩৯. *হাক্বীক্বাতুল খাওয়ারিজ*, পৃঃ ২৯-৩০।

সরকারের নিকট জনগণের অধিকার

জনগণের নিকটে দেশের শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছেও জনগণের কতিপয় হক বা অধিকার রয়েছে। শাসকের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সকল অধিকার বা হক যথাযথভাবে আদায় করা। শাসক যদি জনগণের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন, তাহলে দেশে কোনরূপ বিশৃংখলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। দেশে বিরাজ করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা। জনগণের উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকার হচ্ছে-

১. জনগণের জান-মাল, ইযযত-আব্রু, মান-সম্মান রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। দেশের কোন নাগরিক যাতে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তার যথাযথ ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব।

২. বিপদাপদে জনগণকে সার্বিক সহযোগিতা করা। বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং যথাসম্ভব দ্রুত দুর্গত এলাকার প্রত্যেক নাগরিকের নিকট সাহায্য পৌঁছে দেয়া শাসকের মৌলিক দায়িত্বের অন্যতম।

৩. জনগণের ওপর সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন করা হতে বিরত থাকা এবং অন্যের দ্বারা নির্যাতিত নাগরিকদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা। এর সাথে সাথে অত্যাচারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, যাতে পরবর্তীতে তার দ্বারা অন্য কোন নাগরিক অত্যাচারিত না হয়।

৪. সকল প্রকার অপরাধ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি দূরীভূত করে দেশে প্রকৃত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। অপরাধী ও দুর্নীতিবাজ যে দলের লোকই হোক না কেন দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে তার বিচার করে এ জঘন্য পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা। সাথে সাথে অন্য কেউ যাতে এই পথে অগ্রসর না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৫. দেশে আদল-ইনছাফ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে সুবিচার পায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তেমনি বিচারকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা কোন মহল দ্বারা হামলার শিকার না হন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি যাতে সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সমাধা করতে পারেন তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ কেউ যেন বিচারকের প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ বা বল প্রয়োগ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিচারকও যেন প্রভাবিত না হন সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. অনাথ-ইয়াতীম, নিঃস্ব-অসহায়, দরিদ্র-বঞ্চিত ও দুঃস্থ মানুষকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে। এজন্য দেশের ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করে তাদেরকে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

৭. দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বেকারত্ব মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। এজন্য বেকারত্ব দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৮. দেশের সকল নাগরিক যাতে স্ব-স্ব ধর্মকর্ম নির্বিঘ্নে পালন করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে কোন সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা যাতে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মকর্ম পালনে বাধাগ্রস্ত না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته. ‘জেনে রেখ, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জনগণের জন্য যাকে নেতা নিযুক্ত করা হয়, সে তার জনগণের উপর দায়িত্বশীল। অতএব সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞসিত হবে’।[২৪০]

কোন শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি জনগণের অধিকার যথাযথভাবে প্রদান না করেন এবং তাদের প্রতি তাঁর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা পালন না করেন, তাহলে পরকালে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হল।

একই মর্মে আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله يقول من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.

আবু মরিয়ম আল-আযদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি মু‘আবিয়া (রাঃ)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমানদের কোন কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে যদি তাদের প্রয়োজন ও অভাবের সময় নিজেকে

২৪০. ***বুখারী***, হাদীছ নং ৮৯৩; ***মুসলিম***, হাদীছ নং ১৮২৯; ***রিয়াযুছ ছালেহীন***, হাদীছ নং ৬৫৩, পৃঃ ২৩৯।

আড়াল করে রাখেন, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন ও অভাবের সময় আল্লাহ পাকও নিজেকে আড়াল করে রাখবেন। এরপর থেকে মু'আবিয়া (রাঃ) মানুষের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতেন'।[২৪১]

কোন শাসক যদি প্রজাদের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাদের সাথে প্রতারণা করে, তাহলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.

আবু ই'য়ালা মা'ক্বাল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা তার অধীনস্থদের দায়িত্ব প্রদান করার পর সে যদি তাদের ব্যাপারে খিয়ানত করে তথা প্রজাদের (প্রতি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে বরং) ধোঁকা দেয় এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন'।[২৪২]

কোন শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি জনগণের প্রতি নির্যাতন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দিবেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عن هشام بن حكيم بن حزام قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـــول إن الله يعذب الذين يعذبون (الناس) في الدنيا.

হিশাম ইবনু হাকিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যেসব শাসক দুনিয়াতে মানুষের উপর নির্যাতন চালায়, আল্লাহ তাদেরকে (ক্বিয়ামতের দিন) কঠিন শাস্তি দিবেন'।[২৪৩]

শাসকের দায়িত্ব সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন বলেন, 'শাসকদের নিকটে প্রজাদের হক্ব হচ্ছে যে, এটা একটা মহান দায়িত্ব এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং মর্যাদা বৃদ্ধি নেতৃত্বের উদ্দেশ্য নয়। বরং নেতৃত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্যের লক্ষ্যে তাঁর সৃষ্টির মাঝে হক প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করা। আর আল্লাহর বান্দাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সংস্কার-সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করা'।[২৪৪]

---

২৪১. ***আবুদাউদ***, হাদীছ নং২৯৪৮; ***তিরমিযী***, হাদীছ নং ১৩৩২; ***রিয়াযুছ ছালেহীন***, হাদীছ নং ৬৫৮।
২৪২. ***বুখারী***, হাদীছ নং ৭১৫০; ***মুসলিম***, হাদীছ নং ১৪২; ***রিয়াযুছ ছালেহীন***, হাদীছ নং ৬৫৪।
২৪৩. ***মুসলিম***, হাদীছ নং ২৬১৩।
২৪৪. وأما حقوق الرعية على ولأهم فالمسؤولية كبيرة، والأمر خطير، فليس المقصود بالولاية بسط السلطة ونيل المرتبة، إنما المقصود بها تحمل مسؤولية عظيمة تتركز على إقامة الحق بين الخلق بنصر دين الله وإصلاح عباد الله دينيا ودنيويا. দ্র: ***আল-হুকমু বিগাইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর***, পৃঃ ৭৩।

চতুর্থ অধ্যায় : মুসলিমকে কাফির আখ্যায়িত করা

মুসলিমকে কাফির আখ্যাদানের বিধান

চরমপন্থী জঙ্গীরা গোনাহগার মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলে ফৎওয়া দিয়ে থাকে। অথচ কাউকে কাফির আখ্যায়িত করার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) মানুষকে সতর্ক করেছেন। বিনা কারণে কাউকে কাফির বলে গণ্য করার শাস্তিও ইসলামী শরী'আতে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে কি-না, কি কি দোষ-ত্রুটি থাকলে মানুষকে কাফির বলা যায় এবং অযথা কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলার পরিণতি কি এসব বিষয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

কাফির আখ্যাদান সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সতর্কবাণী :

মুসলিম ব্যক্তিকে যথেচ্ছা কাফির বলার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ সকলকে হুঁশিয়ার করেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুমিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন' *(নিসা ৯৪)*।

এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাফসীর ইবনু কাছীরে (রহঃ) এসেছে,

عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسلم عليهم فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الأية "يا أيها الذين أمنوا ..." إلى أخرها.

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি মেষপাল চরাতে চরাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের এক দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে তাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম প্রদান করল। তারা ধারণা করে বললেন, এ লোক কেবল আমাদের নিকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সালাম দিয়েছে। এ বলে তারা তাকে হত্যা করলেন। আর তার মেষপাল গনীমতের সম্পদ হিসাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত করলেন। অতঃপর আয়াতটি নাযিল হয়।[২৪৫]

২৪৫. ***তিরমিযী,*** 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৩০৩০; ***তাফসীর ইবনু কাছীর,*** ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০৪।

আলোচ্য আয়াতে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তিকে মুমিন নয় বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করতে হবে। ব্যাপক তদন্ত ও যাচাই-বাছাই ব্যতীত এধরনের কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা এবং তাকে হত্যা করা হারাম।

কাফির আখ্যাদান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সতর্কবাণী :

কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে কাফির বলে সম্বোধন করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে কাউকে অযথা কাফির বলার পরিণতিও বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. 'কোন ব্যক্তি অন্যকে পাপাচারী ও কাফির বলে সম্বোধন করবে না। যদি কেউ এরূপ করে আর সম্বোধনকৃত ব্যক্তি সেরূপ না হয়, তাহলে তার এ উক্তি তার (সম্বোধনকারীর) দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে'।[২৪৬]

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করল, তার এ বাক্য তাকে সহ দু'জনের একজনের দিকে ফিরে আসবে'।[২৪৭] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, أيما رجل كفر رجلا فأحدهما كافر. 'কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করলে তাদের দু'জনের যে কোন একজন কাফির হিসাবে গণ্য হবে'।[২৪৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, إذا قال لصاحبه يا كافر فإنها تجب على أحدهما فإن كان الذي قيل له كافر فهو كافر وإلا رجع إليه ما قال. 'যদি কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এই কাফির! তাহলে তার এ উক্তি তাদের দু'জনের একজনের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হচ্ছে সে যদি প্রকৃতই কাফির হয়, তাহলে সে তো কাফির। অন্যথা কাফির বলে সম্বোধনকারীই কাফির হয়ে যাবে'।[২৪৯]

উপরোল্লিখিত হাদীছগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বিনা কারণে কাফির বলে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ ঐ ব্যক্তির মধ্যে কাফির হওয়ার মত কোন দোষ-ত্রুটি না থাকলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা বৈধ নয়।

---

২৪৬. ***বুখারী,*** হাদীছ নং ৬০৪৫।
২৪৭. ***বুখারী,*** হাদীছ নং ৬১০৩, ৬১০৪।
২৪৮. ইমাম আহমাদ, ***মুসনাদু আহমাদ,*** ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪, ৪৭, ৬০, ১০৫, সনদ ছহীহ।
২৪৯. ***মুসনাদু আহমাদ,*** হাদীছ নং ৫৭৯০।

কাফির আখ্যায়িত করার প্রবণতা ও কারণ

চরমপন্থী খারেজীদের মত বর্তমানেও মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে কাফির বলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে দেশের সরকার, আলেম-ওলামা থেকে শুরু করে সবাইকে কাফির বলে ফৎওয়া প্রদান করে। মূলতঃ যারা তাদের মত ও পথের অনুসারী নয় তাদেরকেই চরমপন্থীরা কাফির মনে করে। অথচ মুসলিম ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করলেও তাকে কাফির বলা যাবে না। কৃত গুনাহের জন্য সে ফাসিক, ফাজির তথা পাপাচারী হবে কিন্তু সে কাফির হবে না।

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, إن مسألة التكفير ليس فقط للحكام، بل وللمحكومين أيضا هي فتنة قديمة تنبتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي بالخوارج. منها فرقة لا تزال موجودة الآن باسم أخر وهي الإباضية. 'কেবলমাত্র শাসকদেরকেই নয় বরং সাধারণ মুসলিমদেরকেও কাফির আখ্যায়িত করার বিষয়টি একটি অতি পুরাতন ফিৎনা। ইসলামের মধ্যে খারেজীরা এরূপ ফিৎনার আবির্ভাব ঘটায়। বর্তমান যুগেও বিভিন্ন নামে তাদের অনুসারী রয়েছে। তাদের একটি দল হচ্ছে 'ইবাযিয়া'।[২৫০] 'ঐসব চরমপন্থীরা মসজিদের ইমাম, খত্বীব, মুওয়াযযিন ও খাদেমদেরকেও কাফির বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, মাদরাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে কাফির বলার কারণ কি? তাহলে তারা এর কারণ হিসাবে বলে যে, সরকার আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত যে ফায়ছালা করে তার প্রতি তারা সন্তুষ্ট থাকে'।

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে- (১) তাদের ইলমী অজ্ঞতা ও দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা। (২) ইসলামী দাওয়াতের সঠিক মূলনীতি ও শারঈ বিধান যথাযথভাবে অনুধাবন না করা। (৩) নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য ও হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হওয়া।[২৫১]

কাফির আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে চরমপন্থীদের দলীল

চরমপন্থীরা মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ও শাসকদেরকে নিম্নোক্ত দলীলের ভিত্তিতে কাফির বলে থাকে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُوْنَ 'যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করে না, তারা কাফের' *(মায়েদা*

২৫০. শায়খ আলবানী, ***ফিৎনাতুত তাকফীর***, পৃঃ ১২, ২২।
২৫১. ***তদেব***, পৃঃ ১৩, ২০।

৪৪)। অথচ এই একই বিষয়ে পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُـــم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلَـــئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালিম' *(মায়েদা ৪৫)*। এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক আরো বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلَـــئِكَ هُمُ الْفَاســـقُوْنَ. 'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না তারা ফাসিক' *(মায়েদা ৪৭)*। উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে চরমপন্থীরা কেবল প্রথম আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে সরকারকে কাফির আখ্যায়িত করে এবং তাদের আনুগত্য পরিহার করে। তাদের মতে, যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না, তাদের মধ্যে এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত মমার্থ :

কখনো কখনো কুফর দ্বারা আমলের ক্ষেত্রে কুফরকে বুঝানো হয়ে থাকে। যা দ্বারা মানুষ ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হয় না বরং গোনাহগার হয়। কিন্তু ই'তিক্বাদী বা বিশ্বাসগত কুফরের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। কারণ কোন ব্যক্তি ইসলামের কোন বিধানকে অস্বীকার করলে সে কাফির হবে, কিন্তু যদি সে ইসলামের বিধান স্বীকার করে এবং অলসতাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে তা পালনে গাফলতী করে তাহলে গোনাহগার হবে, কাফির হবে না।

সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সালাফে ছালেহীন ও মুফাসসিরগণের বক্তব্য :

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به و لم يحكم به فهو ظـــالم فاســـق. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি উহাকে স্বীকার করল কিন্তু সেই অনুযায়ী বিচার করল না সে যালিম ও ফাসিক।'[২৫২] অন্য একটি বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة، وهو كفر دون كفـــر. 'তোমরা এ কুফর দ্বারা যে অর্থ বুঝাতে চাচ্ছো তা নয়। এটি এমন কুফর নয়, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বরং এ কুফর দ্বারা বড় কুফরের নিম্ন পর্যায়ের কুফরকে বুঝানো হয়েছে'।[২৫৩]

---

২৫২. ইবনু জারীর, ***তাফসীরে তাবারী,*** ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭; ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, ***যাদুল মাসীর,*** ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬; ***তাফসীর ইবনু কাছীর,*** ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫-৮৬।
২৫৩. ইমাম হাকিম নাইসাপুরী, ***মুস্তাদরাকে হাকিম,*** ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) যাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেন তারা সেই চরমপন্থী খারেজী সম্প্রদায় যারা আলী (রাঃ)-এর নেতৃত্ব হতে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারা মুমিনদের হত্যা করেছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে এমন ঘটনা ঘটিয়েছিল যা মুশরিকেদের সাথেও করেনি।[২৫৪]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা সঠিক ও যথার্থ প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. 'মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দু'টি কুফরী বিষয় হচ্ছে বংশকে দোষারোপ করা এবং মৃতব্যক্তির জন্য জাহিলী যুগের রীতিতে ক্রন্দন করা'।[২৫৫]

এ হাদীছে বর্ণিত কুফরী দ্বারা এমন কুফরীকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হয় না। সুতরাং ইবনু আব্বাস (রাঃ) (فأولئك هم الكافرون)-এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তা সঠিক।[২৫৬]

২. ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) ও আল-হাসান (রহঃ) বলেন, هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، أي معتقدا ذلك ومستحلا لــه. 'এটা ঐ সকল লোকের জন্য আম হুকুম যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না। অর্থাৎ যারা বিশ্বাসগতভাবে (তা প্রত্যাখ্যান) করে এবং (অন্য বিধান দ্বারা বিচার করা) হালাল বা বৈধ মনে করে'।[২৫৭] আল্লামা সুদ্দী ও ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ)-এর অভিমতও অনুরূপ।

৩. তাবিঈ ইকরিমা (রহঃ) বলেন, ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فقد كفر، ومن أقر به و لم يحكم به فهو ظالم فاسق. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করতঃ সে অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করল না সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি উহাকে স্বীকার করল কিন্তু সেই অনুযায়ী বিচার করল না সে যালিম ও ফাসিক'।[২৫৮]

৪. মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, من ترك الحكم بما أنزل الله ردًا لكتاب الله فهو كــافر ظــالم فاســق. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না আল্লাহর কিতাব (কুরআন)-কে প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যে সে কাফির, যালিম, ফাসিক'।[২৫৯]

---

২৫৪. ***ফিৎনাতুত তাকফীর,*** পৃঃ ১৯।
২৫৫. ***মুসলিম,*** হাদীছ নং ৬৭।
২৫৬. ***ফিৎনাতুত তাকফীর,*** পৃঃ ১৯-২২।
২৫৭. ***তাফসীরে তাবারী,*** ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৫৭।
২৫৮. ***মুখতাছার তাফসীরে খাযেন,*** ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০।
২৫৯. ***ঐ,*** পৃঃ ৩১০।

৫. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান স্বীকার করে এবং অন্য বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করা হালাল মনে না করে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা না করাকে নাফরমানী গণ্য করে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যে সমস্ত পাপাচারের হদ (শাস্তি) ও কাফফারা নির্ধারিত নেই, যেমন অপরিচিত বালক বা মহিলাকে চুম্বন করা অথবা সঙ্গম ব্যতীত জড়িয়ে ধরা বা কোলাকুলি করা অথবা অবৈধ জিনিস ভক্ষণ করা কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্যদান বা বিচার-ফায়ছালায় ঘুষ গ্রহণ অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা না করা অথবা প্রজাদের প্রতি যুলুম করা বা জাহিলী যুগের ন্যায় বিলাপ করে শোক প্রকাশ অথবা জাহিলী যুগের ন্যায় বুক চাপড়িয়ে চিৎকার করা, অনুরূপ হারাম কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে পাপ'।[২৬০]

৬. আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله، كما فعلت اليهود، فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করতঃ সে অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করল না অথচ সে জানে যে, উহা আল্লাহ নাযিল করেছেন যেরূপ ইহুদীরা করে, সে কাফির। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার না করে সে অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করল না সে যালিম, ফাসিক্ব।[২৬১]

৭. আল্লামা শানক্বীতী বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলগণের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না, তার কৃত যুলম, পাপাচার ও কুফরী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কারকারী হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না অথচ বিশ্বাস করে যে, সে হারামে নিপতিত হয়েছে, নিকৃষ্ট কাজ করছে, তার কুফরী, যুলম ও ফাসেকী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কারকারী হবে না।[২৬২]

৮. জাতির মহান সংস্কারক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশিষ্ট ইমাম শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত

---

২৬০. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع أو يأكل مالا يحل أو يشهد بالزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدى على رعيته أو يتعزي بعزاء الجاهلية أو يلبى داعي الجاهلية إلى غير ذلك من المحرمات. দ্রঃ ***মাজমূউ ফাতাওয়া***, ২৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩।

২৬১. ***আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর***, পৃঃ ৬৮।

২৬২. ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة لرسل وابطالا لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. দ্রঃ ***তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান***, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪।

বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা না করে সে চারটি বিষয় থেকে মুক্ত নয়- (১) যে বলে, আমি এই বিধান দ্বারা ফায়ছালা করছি কারণ এটা শারঈ বিধান অপেক্ষা উত্তম তাহলে সে বড় কুফরীকারী কাফির। (২) যে বলে, আমি এই বিধান দ্বারা ফায়ছালা করছি কারণ এটা শারঈ বিধানের ন্যায়। সুতরাং এই বিধান দ্বারা এবং শারঈ বিধান দ্বারা ফায়ছালা করা জায়েয, তাহলে সে বড় কুফরীকারী কাফির। (৩) যে বলে, আমি এই বিধান দ্বারা ফায়ছালা করছি, আর শারঈ বিধান দ্বারা ফায়ছালা করা উত্তম। কিন্তু আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া এই বিধান দ্বারা ফায়ছালা করা জায়েয, তাহলে সেও বড় কুফরীকারী কাফির। (৪) যে বলে, আমি এই বিধান দ্বারা ফায়ছালা করছি এবং সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা ফায়ছালা বৈধ নয় এবং শারঈ বিধান দ্বারা ফায়ছালা করা উত্তম কিন্তু সে উদাসীনভাবে এটা করে বা এটা দেশের শাসকের চাপে করে তাহলে সে ছোট কুফরীকারী কাফির, যা দ্বারা সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত হবে না। কিন্তু একে কবীরা গোনাহ গণ্য করা হবে'।[২৬৩]

৯. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'কুফরী দুই প্রকার, বড় ও ছোট। অনুরূপভাবে যুলুম ও ফিসক দুই প্রকার, বড় ও ছোট। সুতরাং কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা না করা, ব্যভিচার, সুদ আদান-প্রদান অথবা অনুরূপ ঐক্যমতে হারাম বিষয়কে বৈধ জ্ঞান করলে, সে বড় কুফরী করবে, সে বড় যুলুম করবে এবং বড় ফাসিক্বী করবে। আর যে এসব বৈধ মনে না করে করবে তার কুফরী হবে ছোট কুফরী, যুলুম হবে ছোট যুলুম, ফাসিক্বীও হবে অনুরূপ'।[২৬৪]

১০. তাফসীরে খাযেন গ্রন্থকার বলেন, 'একদল মুফাসসির বলেন যে, এই তিনটি আয়াত (সূরা মায়েদার ৪৪, ৪৫, ৪৭) কাফির ও ইহুদীদের মধ্যে যারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কেননা মুসলিম যদি কবীরা গুনাহও করে ফেলে তবু তাকে কাফির বলা যাবে না। এ মতের প্রবক্তা হলেন ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ ও যাহ্হাক প্রমুখ'।[২৬৫]

---

২৬৩. ***আল-হুকমু বিগাইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর***, পৃঃ ৭১-৭২।

২৬৪. أن الكفر كفران أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنــزل الله أو الزني أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر، ظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصــغر وظلمــه ظلمــا أصــغر وهكــذا فــسقه. দ্র: ***আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর***, পৃঃ ৭৪; ***ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ***, পৃঃ ১৬২।

২৬৫. فقال جماعة من المفسرين: إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال: إنه كافر، وهذا قول ابن عباس وقتــادة والــضحاك. দ্র: ***মুখতাছার তাফসীরে খাযেন***, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০, গৃহীত: ***আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর***, পৃঃ ৭৮।

আল্লাহ্র বিধান দ্বারা শাসন না করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান :

ওলামায়ে কেরাম আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা না করার কয়েকটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যথা- (১) যে ব্যক্তি মানবরচিত বিধানকে আল্লাহ্র বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির। (২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সে প্রকৃত কাফির। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করতঃ মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করবে সেও প্রকৃত কাফির। (৪) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকেই আল্লাহ্র বিধান বলে দাবী করবে সেও কাফির। (৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয় কিন্তু অপারগতার কারণে এবং পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা বা কোন চাপের কারণে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, সে ব্যক্তি প্রকৃত কাফির নয়। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে না।[২৬৬]

কাফির আখ্যায়িত করতে পারেন কে?

কাউকে কাফির প্রতিপন্ন করার অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য খাছ। কোন মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী কাউকে কাফির আখ্যায়িত করতে পারে না। এ সম্পর্কে বিদ্বান মণ্ডলীর অভিমত নিম্নরূপ-

১. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, '(কাফির প্রতিপন্ন করার) বিষয়ে আবু ইসহাক আল-ইসফেরাইনী ও তার অনুসারীদের মত কোন কোন লোক যা বলে থাকে এটা তার বিপরীত। তারা বলে, 'আমাদেরকে যারা কাফির বলে আখ্যায়িত করে আমরা কেবল তাদেরকেই কাফির প্রতিপন্ন করব'। কিন্তু কাফির প্রতিপন্ন করার বিষয়টি তাদের অধিকার নয়; বরং এটি আল্লাহর হক্ব। আর কোন মানুষ কাউকে মিথ্যাবাদী বললে তাকেও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়। অনুরূপভাবে অশ্লীল কাজ সম্পাদনকারীদের সাথে অশ্লীলতা করা যাবে না। আবার কেউ যদি বলৎকার অপছন্দ করে তবে তার উপর জোর করে বলৎকারের অপবাদ আরোপ করা যাবে না। কেননা এটা আল্লাহর হক্ব হওয়ার কারণে হারাম। যদিও নাছারারা আমাদের নবীকে গালি দেয়, তাই বলে ঈসা (আঃ)-কে আমরা গালি দেব না। আবার রাফিযীরা আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-কে কাফির আখ্যায়িত করলেও আমরা আলী (রাঃ)-কে কাফির আখ্যায়িত করব না...। এজন্য বিদ্বানগণ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাদের বিরোধীদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেন না, যদিও ঐ বিরোধীরা কুফরী করে থাকে।

২৬৬. ***আল-উরওয়াতুল উছক্বা***, পৃঃ ১৬৭; ***আল-জিহাদ ওয়াল ক্বিতাল ফিস সিয়াসাহ আশ-শারইয়াহ***, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭।

যেহেতু কাফির প্রতিপন্ন করা শারঈ হুকুম। সুতরাং কাউকে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া কোন ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয়। যেমন কেউ যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে কিংবা তোমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে তোমার জন্য এটা উচিত হবে না যে, তুমিও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে কিংবা তার স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে। কেননা এটা আল্লাহর হক্ব হওয়ার কারণে হারাম। অনুরূপভাবে কাফির প্রতিপন্ন করাও আল্লাহর হক্ব। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে কাফির বলেছেন তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে কাফির বলা যাবে না'।[২৬৭]

২. শায়খ ইবনু উছাইমীন (রহঃ) বলেন, الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صـــ فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 'কাফির ও ফাসিক হওয়ার হুকুম প্রদান আমাদের অধিকার নয়; বরং এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক্ব। আর এটা শারঈ বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রত্যাবর্তন কিতাব ও সুন্নাতের দিকে। সুতরাং এ ব্যাপারে তার উপরেই চূড়ান্তভাবে অটল থাকা আবশ্যক। অতএব যার কাফির ও ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাতের দলীল রয়েছে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফির বা ফাসিক আখ্যায়িত করা যাবে না'।[২৬৮]

৩. খালিদ আল-আম্বারী বলেন, 'কাফির প্রতিপন্ন করার হুকুম শারঈ এবং কেবল আল্লাহর হক্ব। কোন সংস্থা বা দল এর অধিকারী নয় এবং এ ব্যাপারে বিবেক বা মানুষের মস্তিস্কপ্রসূত জ্ঞান বিবেচ্য নয়। এখানে অতি আবেগ ও প্রকাশ্য শত্রুতার কোন স্থান নেই। স্থায়ীভাবে অত্যাচারী ব্যক্তি ও অবাধ্য ব্যক্তির যুলুমের কারণে তার উপর (কাফির আখ্যাদানের হুকুম) প্রযোজ্য হবে না। অথবা অতি প্রতাপশালী শক্তিধর ব্যক্তির শক্তি প্রয়োগ ও গাদ্দারীর কারণে তার উপরও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে কাফির বলেছেন তাকে ব্যতীত অন্যকে কাফির বলা যাবে না'।[২৬৯]

কাফির বিধান প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী

কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন পাপাচার বা কবীরা গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে কাফির হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের কোন রুকন ও ফরযকে অস্বীকার না করে। অথবা যদি কোন গুনাহের কাজকে হালাল মনে না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি দেওয়া, কুরআন মাজীদকে পদদলিত করা ও অবমাননা করে পুড়িয়ে

---

২৬৭. ***আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর***, পৃঃ ১৯-২০।
২৬৮. ***ঐ***, পৃঃ ২১।
২৬৯. ***ঐ***, পৃঃ ১৯।

ফেলা, ব্যভিচারকে বৈধ মনে করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره، فإن زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه كافر... 'কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে গুনাহের কাজকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি যেনা করে, ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে কিংবা মদ পান করে, তবুও তাকে কাফির বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এসব হারাম কাজকে বৈধ মনে না করবে। তবে এসব গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে ফাসিক বলা যাবে'।[২৭০] এছাড়া ইসলাম বিধ্বংসী কতিপয় কাজ রয়েছে, তন্মধ্যে অতি মারাত্মক হচ্ছে ১০টি। এগুলির কোন একটি কারো দ্বারা সংঘটিত হলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। সেই কাজগুলি হচ্ছে-

১. শিরক করা তথা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করা। এই শিরক আল্লাহ্‌র যাত, ছিফাত ও ইবাদত যে কোন ক্ষেত্রে হোক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। শিরক ব্যতীত অন্য যত পাপ রয়েছে তিনি ইচ্ছা করলে সবই ক্ষমা করে দিতে পারেন' *(নিসা ১১৬)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শিরক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এ সকল যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(মায়েদাহ ৭২)*।

২. যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহ্‌র মাঝে মধ্যস্থতা সাব্যস্ত করে এবং তাদের উপর নির্ভর করে ও ভরসা রাখে, সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে কাফির বলে গণ্য হবে।

৩. যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করবে না বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করবে কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে মনে করবে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে।

৪. যে ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শের চেয়ে অন্যের আদর্শকে অধিক পূর্ণাঙ্গ বলে বিশ্বাস করবে কিংবা নবী করীম (ছাঃ) আনীত বিধান অপেক্ষা অন্যের বিধানকে অধিক উত্তম মনে করবে, সে কাফির বলে গণ্য হবে।

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনীত কোন বিধানের প্রতি যদি কেউ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কিংবা তাঁর আনীত বস্তুর প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে। যদিও বাহ্যিকভাবে সে ঐ বিধানের উপর আমলও করে। আল্লাহ পাক বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَـأَحْبَطَ أَعْمَـالَهُمْ 'এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয়কে ঘৃণা করেছে, সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলগুলোকে বরবাদ করে দিয়েছেন' *(মুহাম্মাদ ৯)*।

---

২৭০. ***ফিৎনাতুত তাকফীর***, পৃঃ ৬।

৬. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীনের কোন বিধান বা অন্য কোন কিছু যেমন পুরস্কার বা শাস্তি ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে কাফির। আল্লাহ পাক বলেন, قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـانِكُمْ. ‘(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? কোন প্রকার ওযর-আপত্তির অবতারণা কর না। তোমরা ঈমান আনয়নের পর আবার কুফরী করেছ’ *(তওবা ৬৫-৬৬)*।

৭. যাদু-টোনা করা। কাউকে অন্যের নিকট থেকে ফিরিয়ে রাখা, কাউকে কারো সাথে সংযুক্ত করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করাও যাদুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি যাদু করবে বা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ. ‘ঐ দু’জন (হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়) এই কথা না বলে কাউকে যাদু শিক্ষা দিতেন না যে, নিশ্চয়ই আমরা (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা স্বরূপ। সুতরাং (আমাদের নিকট থেকে যাদু শিখে) কাফির হয়ো না’ *(বাক্বারাহ ১০২)*।

৮. মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ পাক বলেন, وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ. ‘তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের (বিধর্মীদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে হেদায়াত করেন না’ *(মায়েদাহ ৫১)*।

৯. যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনীত শরী‘আতের বাইরে থাকার অবকাশ রয়েছে, সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْـرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে’ *(আলে ইমরান ৮৫)*।

১০. আল্লাহ্র দ্বীন তথা ইসলাম হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হওয়া। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করা, তদনুযায়ী আমল না করা, এ ধরনের মানসিকতার ব্যক্তিও কাফির বলে গণ্য হবে। আল্লাহ পাক বলেন, ‘ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে বেশী যালিম হতে পারে, যাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে স্বীয় প্রতিপালকের আয়াত সমূহ দ্বারা, অতঃপর সে তা হতে বিমুখ হয়েছে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী’ *(সাজদাহ ২২)*।[২৭১]

---

২৭১. শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, ***আল-আক্বীদাতুছ ছহীহা ওয়ামা ইউযাদ্দুহা ওয়া নাওয়াকিযুল ইসলাম***, পৃঃ ২৫-২৯।

এসব ইসলাম বিধ্বংসী কাজকর্ম অতি মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তা অধিক হারে সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলির কোন একটি কোন মুসলিম ব্যক্তি করে ফেললেই তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং কাফির বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য যে সকল শারঈ মূলনীতি বা শর্তাবলী রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে তা না পাওয়া যাবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১। **জ্ঞান থাকা :** যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, তা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে যে, এ কাজ করা কুফরী। আর এ কুফরী কাজ সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান না থাকে তাহলে কুফরী কাজের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পন্থায় তাকে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা :** কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায়, তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ঐ ব্যক্তির থাকতে হবে। যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা না থাকে এবং বাধ্য হয়ে কুফরী কাজ করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না।

৩। **স্মরণ ও ইচ্ছা থাকা :** যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, ইচ্ছাকৃতভাবে তার দ্বারা উক্ত অপরাধ সংঘটিত হতে হবে এবং এ কাজটি যে কুফরী কাজ সেটা তার স্মরণে থাকতে হবে। যদি অনিচ্ছায় বা ভুলক্রমে উক্ত অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।[২৭২]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পাপাচারের কারণেই কাউকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে উল্লিখিত শর্তাবলী পাওয়া যাবে। সুতরাং কুরআনের বিধান অনুযায়ী শাসন করতে না পারায় দেশের শাসকবৃন্দ, তাদের সহযোগী বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে ঢালাওভাবে কাফির ফৎওয়া দিয়ে তাদের আনুগত্য পরিহার করা, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সমীচীন নয়।

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করার শর্ত সম্পর্কে শায়খ ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান বলেন, 'কাউকে কাফির বলার ব্যাপারে শরী'আত সম্মত মূলনীতি আছে। অতএব যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত কর্তৃক নির্ধারিত ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহের কোন একটি করে বসবে, তার নিকট দলীল উপস্থাপনের পর তাকে কাফির বলে ফায়ছালা দেয়া যাবে। (অর্থাৎ দলীল দিয়ে তাকে বুঝানোর পরও সে ঐ কাজ করলে তাকে

২৭২. ***ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস***, পৃঃ ৬৮-৬৯।

কাফির বলা যাবে। এর পূর্বে তাকে কাফির বলা যাবে না।) আর যে ব্যক্তি এসব ইসলাম ভঙ্গকারী বস্তু হতে কোন কিছু সম্পাদন না করবে, সে কাফির হবে না, যদিও সে এমন কবীরাহ গুনাহ করে বসে, যা শিরকের চেয়ে নিম্নস্তরের'।[২৭৩]

শায়খ ইবনু উছাইমীন বলেন, 'কাফির বলার ব্যাপারে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট কাজটি কুফরী হিসাবে দলীল থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত কুফরী কাজ সম্পাদনকারীর ব্যাপারে কুফরী ফৎওয়া দানের বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। কেননা কোন কোন উচ্চারিত বাক্য হয় স্পষ্ট কুফরী তথাপি বক্তাকে কাফির বলা হয় না। এ রকম অনেক বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি' *(নাহল ১০৬)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ জবরদস্তকৃত ব্যক্তি থেকে কুফরীর বিধান উঠিয়ে নিয়েছেন, যদিও সে তা মুখে উচ্চারণ করে।

অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) খরব দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দার তওবার দ্বারা ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে নিজ বাহন হারিয়ে ফেলেছে যার উপর তার আহার-পানীয় ছিল। ফলে নিরাশ হয়ে বৃক্ষের নীচে শুয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখতে পায় যে তার উটনীটি তার নিকট উপস্থিত। সে উটটির লাগাম ধরে খুশিতে আহ্লাদিত হয়ে বলে ফেলে, হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আর আমি আপনার প্রতিপালক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, লোকটি খুশিতে আহ্লাদিত হয়ে ঐভাবে ভুল করেছিল।[২৭৪] অথচ সে কারণে সে কাফির হয়নি। যদিও তার উচ্চারিত বাক্যটি ছিল প্রকাশ্য কুফরী বাক্য।

একইভাবে ঐ ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ্য, যে বলেছিল, আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে সমর্থ হন, তবে আমাকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন যা বিশ্ববাসী কাউকে দেননি। তাই সে তার পরিবার-পরিজনকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, তার মৃত্যুর পরে তারা যেন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে তা সাগরে ছিটিয়ে দেয় (তারা তাই করেছিল)। মহান আল্লাহ তাকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, (কেন তুমি এমনটি করেছিলে?) উত্তরে সে বলেছিল, হে প্রতিপালক! আপনার ভয়ে আমি ঐরূপ করেছিলাম। (ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন)।[২৭৫] এ লোকটিও কাফির হয়নি...।[২৭৬]

---

২৭৩. والتكفير له ضوابط شرعية، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل السنة والجماعة حكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه، ومن لم يرتكب شيئا من هذه النواقض فليس بكافر وإن ارتكب بعض الكبائر التي هي دون الشرك. দ্রঃ ***ফাতাওয়াল আইম্মা ফিন নাওয়াযিলিল মুদলাহাম্মাহ,*** পৃঃ ১৬৭-৬৮; ***মুরাজাআত ফী ফিক্বহিল ওযাক্বি' আস-সিয়াসী ওয়াল ফিকরী,*** পৃঃ ৪৯; ***ছিলাতিল গুলূ ফিত তাকফীর বিল জারীমাহ,*** পৃঃ ৭৯।

২৭৪. ***মুসলিম,*** হাদীছ নং ২৭৪৭।

২৭৫. ***বুখারী,*** 'কিতাবুত তাওহীদ', হাদীছ নং ৬৯৫২; ***মুসলিম,*** 'কিতাবুত তওবাহ', হাদীছ নং ৪৯৪৯।

উক্ত লোকটি কাফির হয়নি যদিও তার কুফরী স্পষ্ট। কারণ পুড়িয়ে ছাই করা হলে আল্লাহ আর তাকে পাকড়াও করতে পারবেন না এমন বিশ্বাস নিঃসন্দেহে কুফরী। কিন্তু লোকটি ছিল মূর্খ। তবে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ছিল বিধায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) সম্মানের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সিজদা করেছিলেন। তার এই কাজটি যদিও স্পষ্ট কুফরী ছিল কিন্তু সে কারণে তিনি কাফির হননি। কারণ তিনি বুঝতে ভুল করেছিলেন। ঘটনাটি এরূপ : আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'আয (রাঃ) সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-কে সিজদা করলেন। এ দেখে তিনি বললেন, একি করছ হে মুআয! তিনি বললেন, আমি সিরিয়া গিয়ে দেখলাম, তারা (খৃষ্টানরা) তাদের নেতা ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের সিজদা করছে। তাই আমি মনস্থ করে রেখেছিলাম যে, আমরাও আপনার সাথে ঐরূপ করব। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এমনটি তোমরা কর না। কারণ আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই মহিলাকে স্বীয় স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! কোন নারী আল্লাহ্‌র হক্ব আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না স্বামীর হক্ব আদায় করবে। যদি সে তাকে উটের হাওদাজে উপবিষ্ট অবস্থায়ও আহ্বান করে তবুও সে তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে না'।[২৭৭]

ছাহাবী হাত্বিব বিন আবী বালতাআহ গোপনে নবী করীম (ছাঃ)-এর মক্কা বিজয়ের দৃঢ় সংকল্পের কথা মক্কার কাফিরদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে জনৈকা মহিলার নিকটে একটি পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল ছাহাবীকে মক্কার কাফিরদের নিকটে তা প্রকাশ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এরপরেও উক্ত ছাহাবী মুশরিকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে মহানবীর যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা জানাতে উদ্ধত হয়েছিলেন। অহি-র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত সংবাদ অবগত হয়ে লোক পাঠিয়ে 'রওযায়ে খাক' নামক স্থান থেকে উক্ত মহিলার নিকট থেকে পত্রটি উদ্ধার করেন। হাত্বিব বিন আবী বালতাআহকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল (ছাঃ)! আমার এমন কোন আগ্রহ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী হই। তবে আমি চেয়েছিলাম, যাতে করে মক্কার ঐসব লোকেরা আমার অনুগত থাকে যাদের দ্বারা আমার পরিবার ও সম্পদ রক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সে সত্য বলেছে। তোমরা তাকে ভাল কথা ব্যতীত অন্য কিছু বলবে না'।[২৭৮]

---

২৭৬. ***ছিলাতিল গুলূ ফিত তাকফীর বিল জারীমাহ,*** পৃঃ ২২৩-২৪।
২৭৭. ***ইবনু মাজাহ,*** 'বিবাহ' অধ্যায়, হাদীছ নং ১৮৪৩।
২৭৮. ***বুখারী,*** 'মুরতাদদের থেকে তওবা তলব' অধ্যায়, হাদীছ নং ৬৪২৬, 'মাগাযী' অধ্যায়, হাদীছ নং ৩৬৮৪।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ছাহাবী হাত্বিব বিন আবি বালতাআহ যে কাজটি করেছিলেন, তা অবশ্যই কুফরী কাজ ছিল। কারণ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সাহায্য করা কুফরী, যা ইসলাম ধ্বংসের অন্যতম কারণ। কিন্তু এরপরেও নবী করীম (ছাঃ) তাকে কাফির বা মুরতাদ আখ্যা দেননি, বরং তার নিকট থেকে উক্ত কুফরী কাজের প্রকৃত কারণ জানতে পেরে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং সকলকে তার সম্পর্কে মন্দ বলতেও নিষেধ করেছিলেন। এ ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে কুফরী কাজ সংঘটিত হয়ে গেলেও তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং তার সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে হবে। কিন্তু উগ্রপন্থী জঙ্গীরা খারেজীদের ন্যায় পাপী মুসলিমদেরকেও আমভাবে কাফির ফৎওয়া দিয়ে থাকে, যা আদৌ ঠিক নয়।

অবশ্য কেউ শরী'আতের কোন বিষয়কে ঠাট্টা করলে সে প্রকৃত কাফির বলেই বিবেচিত হবে। কারণ এ কাজ সে আন্তরিকভাবে ও স্বেচ্ছায় করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম মাত্র। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, ঈমান প্রকাশ করার পর তোমরা কাফির হয়ে গেছ' *(তওবা ৬৫-৬৬)*।

কাফির আখ্যাদান হারাম প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের অভিমত

১. ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, 'নিরানব্বই দিক থেকে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করার সম্ভাবনা থাকে, আর এক দিক থেকে যদি তার ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মুসলিমের উপর ভাল ধারণা পোষণ করার লক্ষ্যে তাকে ঈমানদার হিসাবেই আমি গণ্য করব'।[২৭৯]

২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিচারক ও আলেমদেরকে বলতেন, 'তোমরা যেসব কথা বল আমি যদি তা বলতাম, তাহলে অবশ্যই কাফির হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে কাফির আখ্যা দিতে পারছি না। কারণ তোমরা আমার দৃষ্টিতে অজ্ঞ'।[২৮০]

৩. ইমাম নববী (রহঃ) ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, 'জেনে রাখুন! হক্বপন্থীদের মাযহাব এই যে, গুনাহের কারণে ক্বিবলাপন্থী কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। এমনকি প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারী খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে

---

২৭৯. ***ফিৎনাতুত তাকফীর,*** পৃঃ ৬২।
২৮০. ***তদেব,*** পৃঃ ৬৩।

জেনে শুনে অস্বীকার করবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির। তবে যদি নওমুসলিম হয় অথবা দূরবর্তী এমন কোন গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী হয় যার নিকট ইসলামের সমস্ত নিয়ম-কানূন পৌঁছেনি সে কাফির হবে না। তাকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অবহিত করার পরেও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। অনুরূপভাবে যদি যেনা অথবা মদ পান কিংবা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের হারাম কর্মকে জেনে শুনে হালাল মনে করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে'।[২৮১]

৪. ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, 'কখনো কখনো মৌখিক কথা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয়। এর ফলে এ কথার প্রবক্তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যেতে পারে এভাবে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে সে কাফির। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কুফরী কথা বলে তাহলে নির্দিষ্ট করে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপক্ষে এমন দলীল প্রতিষ্ঠিত না হবে যা তাকে কাফির হিসাবে প্রমাণ করে'।[২৮২]

তিনি আরো বলেন, 'মুহাদ্দিছ, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী জমহূর ফক্বীহ, সকল ছূফী, দার্শনিক মতবাদের অনুসারী মু'তাযিলা ও খারিজীদের একদল ও অন্যান্য অনেকে এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, যার নিকটে রিসালাত সম্পর্কে প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও সে তার উপর ঈমান আনে না সে কাফির'।[২৮৩]

তিনি আরো বলেন, يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر ... بل جلــد هـــذا. 'সালাফী মনীষীগণ আক্বীদার ক্ষেত্রে ভূমিকাতেই বলে থাকেন যে, আমরা কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করি না এবং কোন অপকর্মের জন্যও ইসলাম থেকে কাউকে খারিজ করে দেই না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অনেক মানুষের দ্বারা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপানের মত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের ব্যাপারে কাফের হওয়ার বিধান পেশ করেননি।... বরং তিনি এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান করেছেন।[২৮৪]

৫. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহাব বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে না জেনে আবদুল কাদির জিলানী অথবা সাইয়্যিদ বাদাবীর কবরে সিজদা করে,

---

২৮১. ***তদেব***, পৃঃ ৬২।
২৮২. ***তদেব***, পৃঃ ৭৩।
২৮৩. أهل الحديث وجمهور الفقهاء من الماكية والشافعية والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الكلام من متكلمي الـــسنة وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم: متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كـــافر.
দ্রঃ খালিদ ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-আম্বারী, ***আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছূলুত তাকফীর*** (রিয়ায : মুওয়াসসাসাতুল জারীসী, ৩য় প্রকাশ : ১৪১৭ হিজরী), পৃঃ ১৬।
২৮৪. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, ***মাজমুউ ফাতাওয়া***, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭০-৭৬।

তাহলেও তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। তবে ইসলামের বিধান ও দলীল সম্পর্কে জানার পরেও যদি সিজদা করে তাহলে সে কাফির'।[২৮৫]

৬. আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'সেই সব মুসলিমদেরকে আমরা কাফির আখ্যা দিতে পারি না, কারণ তাদের নিকট কাফির আখ্যা দানের দলীলগুলো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা হয়নি। কেননা তাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ দাঈ (দাওয়াতদাতা) নেই, যারা জনগণের দ্বারপ্রান্তে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম'।[২৮৬]

৭. শায়খ আবদুল আযীয ইবনু বায (রহঃ) বলেন, 'খারেজী সম্প্রদায় গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দিয়েছে এবং গুনাহগারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও শাস্তির দিক থেকে (অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী) খারেজীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে। কিন্তু তারা তাদেরকে কুফর এবং ঈমান উভয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় স্থান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এসবই ভ্রষ্টতা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাই চির সত্য। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল মনে না করবে'।[২৮৭]

৮. ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, وأما نحن فنقول إن كل من كفر فهو فاسق ظالم عاصى وليس كل فاسق ظالم عاص كافرا بل قد يكون مؤمنا بالله التوفيق. 'আমরা বলি, যারাই কুফরী করে তারা ফাসেক, যালেম, অবাধ্য-পাপী। আর প্রত্যেক ফাসেক যালেম, পাপী কাফের নয়; বরং আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী কিছুটা হলেও মুমিন থাকে'।[২৮৮]

৯. আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) বলেন, لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. 'কবীরা গুনাহ বা অন্যান্য পাপের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যায় না'।[২৮৯]

১০. ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) বলেন, ولا أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ولانقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 'আমরা এমন কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করি না, যে অপরাধ তার (জান-মাল) হালাল করে না। আবার এটাও বলি না যে, সে যে অপরাধ করে তা তার ঈমানের ক্ষতি করে না'।[২৯০]

---

২৮৫. ***ফিৎনাতুত তাকফীর***, পৃঃ ৬৩।
২৮৬. ***তদেব***, পৃঃ ৭৪।
২৮৭. ***তদেব***, পৃঃ ৫৯।
২৮৮. ***আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল***, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।
২৮৯. আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, ***কাৎফুছ ছামার***, পৃঃ ৮৪।
২৯০. ***শরহু আল-আক্বীদাতুত ত্বাহাবিয়াহ***, পৃঃ ৩৫৫।

জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ড. গালিবের আপোষহীন বক্তব্য

প্রিয় দেশবাসী! আমরা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছি যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী'০৫ দিবাগত রাতে কথিত জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত সন্দেহে গ্রেফতার করে দেশের একাধিক যেলায় হত্যা, ডাকাতি, বোমা হামলা সহ প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হচ্ছে। অথচ জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ যাবতীয় নাশকতার বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই ছিলেন আপোষহীন। তাঁর বক্তব্য, বিবৃতি, লেখনী, সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সবই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এবং জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। নিম্নে সচেতন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করা হল :

ড. গালিব প্রণীত 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের কতিপয় বক্তব্য :

১. 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র' (*ইক্বামতে দ্বীন*, পৃঃ ২৭)।

২. 'রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র প্রস্তুতি হিসাবে দেশে সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়। এর পরেও কারো জন্য বেআইনীভাবে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি ইসলামে নেই' *(ঐ, পৃঃ ২৮)*।

৩. 'তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমে'র অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদে'র অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা'*(ঐ, পৃঃ ৩১)*।

৪. 'এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। ...মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে' *(ঐ, পৃঃ ৩৩)*।

৫. 'জিহাদের নামে এদের চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দিয়ে বর্তমানে দেশদ্রোহী কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। এদের থেকে সাবধান থাকা যরূরী' *(ঐ, পৃঃ ৩৫)*।

৬. 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য' *(ঐ, পৃঃ ৩৯)*।

৭. 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক-এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়' *(ঐ, পৃঃ ৩৯)*।

৮. 'সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও!' *(ঐ, পৃঃ ৪০)*।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত :

১. ১৩/০৮/২০০০ তারিখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন স্বাক্ষরিত ৬৬/১-৩৮/২০০০ নং পত্রে যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে জানানো হয় যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জিহাদের নামে কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বাসী নয়। ... কোন সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক বা সমর্থন নেই'।

২. ৯/১১/২০০১ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে, 'এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী, চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কোনরূপ সমর্থন বা সম্পর্ক নেই। এসব দলের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে সংগঠনের যে কোন স্তরের, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সময়ে সংগঠন হইতে বহিস্কৃত বলিয়া গণ্য হইবেন'।

মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকা :

☐ মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর নিয়মিত বিভাগ 'প্রশ্নোত্তরে' আগষ্ট ২০০০ সংখ্যায় *(প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৩২৪)* এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলা হয়েছে যে, 'বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। ... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না'।

সচেতন দেশবাসী! দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পক্ষে এরকম অসংখ্য বলিষ্ঠ বক্তব্য ও লেখনী উপহার দিয়েও ড. গালিব ও তাঁর সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আজ জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ায় আমরা যার পর নেই মর্মাহত। জাতির বিবেকের নিকটে আমাদের প্রশ্ন এভাবে মিথ্যার জয়জয়কার আর কতদিন চলবে? পরিশেষে দেশবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উপরোক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও 'আন্দোলন'-এর সিদ্ধান্তসমূহ সুবিবেচনা পূর্বক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে অনতিবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দানের জন্য আমরা জোট সরকারের প্রতি আবেদন জানাই।

প্রচারে : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'

মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলে এ প্রচারপত্রটি বিলি করা হয়।